শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

মজদুর ক্রান্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত • ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা • জানুয়ারী ২০১১ • বিনিময় - ২ টাকা

আবার গণহত্যা

সিপিএমের সশস্ত্র ক্যাম্প থেকে গুলিতে নিহত ৮

নন্দীগ্রাম দিয়ে যারা গণহত্যাকারী হিসেবে এরাজ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেই সিপিএমের সশস্ত্র শিবির থেকে নির্বিচারে গুলি চলল আবার, নিহত হলেন ৮ গ্রামবাসী। লালগড় থানার নেতাই গ্রামে কব্জা কায়েম করে সিপিএম প্রথম যে কাজটা করেছিল, তা হল একটা সশস্ত্র শিবির বানানো। যে অনুন্নয়ন নিয়ে গত বছরগুলোতে সোচ্চার হয়েছিলেন নেতাই-লালগড় সহ বিরাট অঞ্চলের মানুষ সেখানে স্কুল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র-জীবিকার বন্দোবস্ত নয়, সিপিএমের হার্মাদবাহিনী নিয়ে এসেছিল সশস্ত্র ক্যাম্প-বোমাগুলি আর সেই হার্মাদবাহিনী যোগ দেওয়ার প্যাকেজ। এলাকায় গত কিছুদিন আগেও যে গণআন্দোলনের উত্তাপ ছিল, তাকে পিষে মেরে দিয়ে শাসক ও বিরোধীরা মেতেছিল সংসদীয় রাজনীতির তরজায়। আসছে ভোট— অতঃপর তার জন্য কোমর বেঁধে নামা।

ক্যাম্প ভর্তি বোমা-গুলি (এমনকি কামানও), হার্মাদদের দঙ্গল সন্ত্রাসের আবহ তৈরী করছিল গোটা গ্রামে। খাদ্য সরবরাহ করতে হবে গ্রামের লোকজনকে, সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে হবে, রাতপাহারা দিতে হবে— আব্দারের শেষ ছিল না। প্রায় ২৫ দিন ধরে ওই দোতলা বাড়ির দখল নিয়েছিল জনা তিরিশেক বহিরাগত যুবক। তাঁদের হাতে অস্ত্র। গ্রামে ঢোকা-বেরোনোর পথে ওই বহিরাগতদের কাছে জবাবদিহি করতে হত গ্রামের যুবক-বৃদ্ধ, এমনকী স্কুলে যাওয়া ছাত্রদেরও। রুটিন বেঁধে দিয়েছিলেন—আজ এই বাড়ি থেকে চাল যাবে, কাল ওই বাড়ি থেকে ডাল যাবে। কে কবে গিয়ে রান্না করবে, তা-ও ওরা ঠিক করে দিয়েছিল। যে বাড়িতে ওঁরা থাকছিল, নেতাই গ্রামের ওই শক্তপোক্ত দোতলা পাকা বাড়ির মালিক সিপিএম কর্মী রথীন দণ্ডপাট। তিনি গ্রামে থাকতেন

শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়

<u>ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর হিসেব প্রকাশ্যে এল</u>

২০09 সালে ১৭,৩৬৮ জন কৃষকের আত্মহত্যা

বিশেষ প্রতিবেদন: ২০০৮ সালে ভারতে যতজন কৃষক আত্মহত্যা করেছিলেন, তার চেয়ে ১১৭২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেন ২০09 সালে। ২০10 এর শেষে ডিসেম্বর মাসে এই হিসেব প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো। তাতে ১৯97 সাল থেকে ২০09 সাল পর্যন্ত মোট আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ালো ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫০০ জন! এর মধ্যে শীর্ষে আছে মহারাষ্ট্র, কর্নাটিক, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। ২৮ টা রাজ্যের মধ্যে ১৮ টা তেই কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা গতবারের তুলনায় বেড়ে গেছে। একদিকে কৃষকের সংখ্যা জীবিকাগত জায়গা থেকে কমে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে বাড়ছে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা, যা স্পষ্টতই দেখিয়ে দিচ্ছে কৃষির সংকটের চিত্রটা।

কেবল জম্মু কাশ্মীর বা উত্তরাখণ্ড-এর মত দু-একটা রাজ্যে এই হারটা খুব একটা বাড়েনি। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটা গতবারের তুলনায় বেড়েছে ২৯৫ জন।

উল্লেখ করার দরকার যে বিগত যে সময়টার হিসেব দেওয়া হচ্ছে, সেই সময়টা জুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতীয় কৃষিতে দেশি-বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ বাড়তি মাত্রায় ঘটেছে। অথচ দেখুন, এর পরেও দেশের সরকার বীজ বিল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ভয়াল দিকে এগোচ্ছে।

বিনায়ক সেনের যাবজ্জীবন

প্রতিবাদ সারা বিশ্বজুড়ে

বিশেষ প্রতিবেদন: ২৪ ডিসেম্বর, ২০১০। 'নিরপেক্ষতা'র মুখোশ খুলে ফেলে আবারও একবার নিজের হিংস্র, পক্ষপাতদুষ্ট মুখটাকে সামনে এনে ফেলল 'ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থা'! বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে শিশু-চিকিৎসক ড: বিনায়ক সেন, প্রবীন রাজনৈতিক কর্মী নারায়ণ স্যান্যাল এবং ব্যবসায়ী পিযুষ গুহকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করলো ছত্তিশগড়ের আদালত। তাঁরা নাকি 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র কাজে যুক্ত ছিলেন!

মানবাধিকার-কর্মী, জনপ্রিয় শিশু-চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠক ড: বিনায়ক সেনকে ২০০৭ সালের ১৪ মে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই সময়েই সাজানো-মামলায় তাঁকে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে রায়পুর, দিল্লি, কোলকাতা, মুম্বাই সহ বিদেশের লন্ডন-বস্টন-নিউইয়র্কেও বহু মানুষ পথে নামেন। প্রতিবাদ জানায় এমনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল-এর মতো সংস্থা, নোয়ম চমস্কির মতো ব্যক্তিত্বরাও।

স্বাভাবিক ভাবেই আদালতের এই পক্ষপাতদুষ্ট রায়ের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। ড: সেনের বিরুদ্ধে কোনো রকম খুন, বিস্ফোরণ, ষড়যন্ত্র অথবা আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ নেই। ক্রিমিনাল কেসে যিনি কখনো অভিযুক্তই হলেন না, তিনি-ই আবার কোন যুক্তিতে 'দেশদ্রোহী হবার অপরাধে' যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আসামী হন! এদেশে লালু যাদব, পাপ্পু যাদব, শশী থারুর, সুরেশ কালমাদি অথবা আন্দিমুথু রাজু'র মতো সাংসদ-মন্ত্রীরা কেউ খুন-জখমের দায়ে, আবার কেউ বা জনগনের কোটি-কোটি টাকা নয়-ছয় করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ান কোন জাদু-বলে?

বছরে একশো দিনের কাজের অন্য কাহিনী

জয়নগরের মোয়া শ্রমিকদের অবস্থা

অরিজিৎ

ভোজনরসিক বাঙালির ভান্ডারে সুস্বাদু আইটেমের ভ্যারাইটির শেষ নেই, তাও যদি মিষ্টি হয় তো কথাই নেই। আর এই শীতের দিনে নলেনগুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা থেকে শুরু করে বাড়িতে শীতকালের নানান পুলিপিঠের আয়োজন, এর মধ্যে সেরা হল মোয়া আর তাও যদি জয়নগরের হয় তো কথাই নেই।

আরে বাবা গুড় তো সব জায়গাতেই পাওয়া যায় তবু জয়নগর কেন? তা বললে বলতে হয় গরু কি আর অন্য জায়গায় নেই- তবু তো দই মোল্লাচকেরই কিংবা বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা; কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, সরভাজা। এগুলো তৈরির কৌশল, কাঁচামালের সহজলভ্যতা আর দিনের পর দিন একই জিনিস প্রচুর পরিমানে তৈরির জন্য বিশেষ ধরনের দক্ষতা; যদিও এই ইতিহাস, এই দক্ষতার খুঁটিনাটি নিয়ে আজ আলোচনা করবো না, আজ একটু দেখে নেব সেই মোয়ার কারিগররা কী করেন - কেমন আছেন।

দীর্ঘদিনের সুনামের হাত ধরে মোয়ার পাইকারী ব্যবসা শুরু হয়েছে, আর তার জন্য প্রতি বছরই শীতের এই তিন মাস ব্যবসার জন্য প্রচুর অস্থায়ী কর্মশালা তৈরী হয়; কোনটি সদ্য তৈরী হওয়া অন্য দোকানের নতুন ঘর ভাড়া নিয়ে, কোনটি ধুঁকে ধুঁকে চলা ভিডিও হল, কোনটি বা মোয়ার জন্যই তৈরী অথচ সারাবছর বন্ধ থাকে, কোনটি বা তিন মাসের বন্ধ রাখা ভাতের হোটেল, কোনটি ঐ মালিকেরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবসার গুদামঘর, কোনোটা বা বাঁশ আর দরমার অস্থায়ী ঘর- যা তিন মাস বাদে খুলে ফেলা হবে।

একজন মালিক অন্য ব্যবসার কিছু টাকা এই ব্যবসায় খাটিয়ে নেয় তিন মাসের জন্য। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গার কিছু বাঁধা দোকান অথবা দালাল ধরা থাকে এই মালিকদের। দিনের উৎপাদন কখনো কখনো ২০ ক্যুইন্টাল ছাপিয়ে যায়। অর্থাৎ আপনি জয়নগরের বাইরে বসে যখন জয়নগরের মোয়া খাচ্ছেন তা যদি জয়নগরের হয় তবে ওয়ার্কশপে পৌঁছানোর আগে আরও দুপ্রকার হাত ঘুরতে হচ্ছে আপনাকে— এক দোকানদার, দুই দালাল। আমরা প্রবেশ করলাম কর্মশালায়। দেখি কী কী লাগে। কাঁচামাল লাগে কনকচূড় ধানের খই, নলেনগুড়, চিনি, অন্য গুড়, ঘি, ক্ষীর আর কাজুবাদাম, কিসমিস, পেস্তা, চেরি, এলাচ ইত্যাদির মত ডেকরেট করার মালপত্র। প্রথমে তৈরী হয় মুড়কি, এক এক বার একটা কড়াইতে হয় ১৫ কেজি মুড়কি। এতে লাগে তিন কেজি চিনি, চার কেজি গুড়, চার কেজি রস— মানে অন্য চিনি আর অন্য গুড়ের মিশ্রণ (এটি বর্তমানে গুড়ের ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দোকানদাররা এটা এমনভাবেই বলেন যেন এটাই রেসিপি, এভাবেই করার কথা। রসটার একটা মজার নাম আছে— কাঁচি— বুঝতেই পারছেন এই রস দিয়েই আসল গুড়ে কাঁচি মারা হয়।) আর বাকিটা খই। উনুনের কাজটা গুরুত্বপূর্ণ, কার্তিক দাস, বুদ্ধিশ্বর দাসের মত কারিগররা যতই দক্ষ হোক না কেন সারা বছর এদের কাজ করতে হয় রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ে হিসাবে না হলে ভ্যান চালক হিসাবে। কিন্তু এ তিন মাস এ কাজ করেন কেন তারা? তার কারন বছরের বাকি সময়ে অন্য যে কাজ করেন সে কাজে অনিশ্চয়তা, তার থেকে এই সময়টায় অন্ততঃ ১০০ দিনের নিয়মিত কাজ পাওয়া যাবে, আর একথাও সত্যি কাজটা ভালোবাসেনও। কেউ কেউ আছেন ঐ মালিকের সাথে গত ২৫-৩০ বছর, ফলে সে ডাকলে ভ্যান চালানো ফেলে আসবেন না এমনটা হতে পারে না। খেয়াল রাখবেন উনুনের কারিগররা লাভ দেখেন তাই আসেন,

শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

অসহ্য মূল্যবৃদ্ধি ও প্রধানমন্ত্রীর অসহ্য ভাষণ

মুদ্রাস্ফীতি ২০% ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বিশেষত খাদ্যপণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পেয়াজ রসুনের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। মসলাপাতির অবস্থাও একইরকম। এই শীতের সময়ে যখন নানান সবজিতে বাজার ভরে থাকে, সেই সবজিতেও মানুষ হাত দিতে ভয় পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মাঝেমধ্যেই বলছেন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সরকার সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শুধু পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা ছাড়া সরকার আর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন আমরা জানিনা। শুধু বাগাড়ম্বরই সার। বাজারে অন্তত সরকারী পদক্ষেপের কোন প্রতিফলন নেই। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম বলেছেন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। ধুর্ত চিদাম্বরম এই সত্য কথাটি কেন প্রকাশ্যে বললেন, তার নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। তবে কথাটা সত্যি। যদিও এই সত্যতা অংশিক।

পুরো সত্যটা হল এই যে, আমাদের দেশের সরকার যে খোলা বাজার নীতি গ্রহণ করেছে, যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে এদেশে লাগু করেছে, তাতে এই মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এমনকি আগামীদিনে দেশের কোন কোন অংশে এবং সমাজের নিচে পড়ে থাকা মানুষদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, একথা বিশ্বায়ন বিরোধী অর্থনীতিবিদরা বারবার বলে আসছেন। আমরা বারবার একথা বলেছি যে, এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ, যতটা না কালোবাজারী জাতীয় ঘটনা তার চেয়ে অনেক বেশি আগাম বাণিজ্য নীতির প্রভাব। শেয়ার বাজারের মত খাদ্যশস্যের দাম নিয়ে ফাটকা হচ্ছে। সরকার বর্তমানে যে অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে চলছে, তাতে এই ফাটকাবাজিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। এই অর্থে চিদাম্বরমের কথা সত্য। প্রধানমন্ত্রী একথা জানেন না তা নয়। তিনি দেশবাসীকে মিথ্যে কথা বলছেন এবং প্রতারিত করছেন। তার ওপর দেশের সরকারগুলো বিগত বছরগুলোতে যে নীতি নিয়েছে তাতে কমেছে চাষের জমির পরিমাণ, ব্যাপকভাবে কমেছে খাদ্যদ্রব্যের ফলন, ভয়াবহ কৃষিনীতির ফলে দেশ ডুবেছে খাদ্যের আকালে। এই অবস্থায় দেশের জন্য মোট যা খাদ্য প্রয়োজন তা যেহেতু নেই, তাই দাম বাড়িয়ে না রাখলেন সেই সীমিত সামগ্রী সমাজের গরিব মানুষরাই কিনে নিতে পারবে, উচ্চবিত্তের তুলনায় সংখ্যাগত ভাবে তারা বহু বেশি হওয়ায়, সংকটে পড়বে উচ্চবিত্ত। সীমিত উৎপাদনকে বন্টনের এই অসম পদ্ধতি নেওয়া ছাড়া এই সরকারের থেকে আর কীই বা আশা করা যায়?

বলা বাহুল্য, এই নীতি শুধু কংগ্রেস দলের, তা কিন্তু নয়। বিজেপি-সিপিএম সহ যারা বিরোধী দল বলে পরিচিত, তারা কেউই কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরোধী নয়। উন্নয়নের নামে এরা যা যা করতে চাইছে তা আসলে এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ারই অঙ্গ।

পরিবর্তনপন্থী তৃনমূল কংগ্রেস যে এই নীতির পরিবর্তন করতে চায়, এমন কথা ভুলেও কখনও বলে না। বরং তারা যে সিপিএমের চেয়ে বেশি 'উন্নয়ন'পন্থী একথা প্রমাণ করতে সর্বদাই ব্যস্ত। আমরা আগেই বলেছি এই সব উন্নয়নের আসল অর্থ কী। মানুষ তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তা ভালমতই আজ বুঝতে পারছেন। উন্নয়ন মানে জমি কেড়ে নেওয়া, উন্নয়ন মানে বস্তি উচ্ছেদ, উন্নয়ন মানে ঠিকা প্রথায় কম মজুরিতে শ্রমিক খাটানো, উন্নয়ন মানে ছোট ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে শপিং মল— এগুলো তো আজ আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা।

২৮০ টাকা কেজি রসুন, ৬০ টাকা কেজি পেঁয়াজ, আর ২০-৩০ টাকা কেজি সিম কিনতে হচ্ছে যে শ্রমিককে তিনি বারো ঘন্টা কাজ করে, ৮০-১০০ টাকা মজুরি পান। আর অসংগঠিত শিল্পে চারভাগের তিন ভাগ শ্রমিকই নাকি দৈনিক ২০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন। এটা সরকারেরই দেওয়া হিসেব। আমদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও তাই। যত 'উন্নয়ন' হয়, এই মানুষগুলোর অভাব তত বেড়ে যায়। তার সঙ্গে ঘটে চলে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি। একে আটকানোর ক্ষমতা, ইচ্ছে, নৈতিক অবস্থান কোনটাই না রাজ্যের না কেন্দ্রের — কোনো সরকারেরই নেই। বিরোধী বলে যারা পরিচিত, তারা তো সব একই পথের পথিক। স্বাভাবিক কারনেই, এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন নেই। কোন কার্যকরী প্রতিবাদ নেই।

আসলে আন্দোলন তাদেরই করতে হবে, যাদের মুখের গ্রাস কেরে নেওয়া হচ্ছে, যাদের দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যাদের অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকেও পথে নামতে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। তার কারন বোধহয় এই সব অনাহার ক্লিষ্ট মানুষদের মনে সংশয় থাকছে যে, আন্দোলন করে কী মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে? আমাদের প্রশ্ন, আন্দোলন না করে কি এই লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে? আন্দোলন না করে কি সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন করা যায়? আসুন না, আমরা একটা সত্যিকারের পরিবর্তনের জন্য জোট বাঁধি, আন্দোলন গড়ে তুলি। আমরা চাইলে কিন্তু পারি। ইতিহাস বারবার আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

বিচারের নামে প্রহসন বন্ধ কর

বিনায়ক সেনদের মুক্তি চাই

শরিফুল ইসলাম

'বিচারের নামে প্রহসন' বললেও কম বলা হয়! চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে সম্প্রতি বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ও মানবাধিকার কর্মী ড: বিনায়ক সেনকে 'যাবজ্জীবন কারাদন্ডে' দন্ডিত করেছে ছত্তিশগড় আদালত। বস্তুত:, ছত্তিশগড়-এর আদিবাসী মানুষের ওপর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস, দমন-পীড়ন তথা সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার 'অপরাধে' অনেকদিন ধরেই ড: সেন রাষ্ট্রের চক্ষুশুল! ২০০৭ সালে পুলিশ প্রথম তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকেই লাগাতার মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে তাঁকে 'দেশদ্রোহী' হিসেবে ছাপ্পা মারার চেষ্টা চলছে। ২০০৮ সালে ড: সেন জন-চিকিৎসা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আন্তর্জাতিক 'জোনাথন মান' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। ২২ জন নোবেল-প্রাপক ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও সেই সময় পুরস্কার নিতে আমেরিকায় যেতে পারেননি বন্দী ড: সেন। অত:পর ২০০৯ সালের শেষে সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি জামিন পান। কিন্তু ভারতীয় বিচারব্যবস্থা যে তাঁকে ছেড়ে দিতে মোটেও প্রস্তুত নয়, তা প্রমান করতে গত মাসের ২৪ তারিখে 'দেশদ্রোহিতার অপরাধে' তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে ছত্তিশগড় আদালত।

এমনই আর একজন গণআন্দোলনের সংগঠক, 'ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা'র প্রবাদপ্রতিম নেতা শঙ্কর গুহনিয়গিকে বেশ কয়েক বছর আগে ভাড়াটে গুন্ডাদের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল খনি-মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার 'অপরাধে'! তাঁরই ভাবশিষ্য, ড: সেনের ওপর এবার নেমে এলো ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার খাঁড়া। খনি-মালিক থেকে কর্পোরেট প্রভু, সরকারি মন্ত্রী-আমলা থেকে আদালতের বিচারক -- সকলেই যখন এ'রকম কিছু কিছু মানুষকে হয় খুন করতে, আর নয়তো দেশদ্রোহী বলে ছাপ্পা মেরে জেলে ঢোকাতে তৎপর হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন ওঠে, কেন এই মানুষগুলো হঠাত রাষ্ট্রের চোখে এত 'বিপজ্জনক' হয়ে উঠল! তবে কি সাপের লেজে পা পড়ে গেছিল? সরকার থেকে আরম্ভ করে পুলিশ-প্রশাসন, বড় বড় পুঁজিপতি - খনি মালিক - কর্পোরেট সংস্থা থেকে শুরু করে আদালতের বিচারব্যবস্থা সকলেই যখন একজোট, তখন কোন সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরা? জনগনের স্বার্থ, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ, আদিবাসীদের স্বার্থের সাথে বড় বড় মালিকদের স্বার্থ, পুঁজিপতিদের স্বার্থ যখন মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে, তখনই খুলে পড়ছে পুলিশ-প্রশাসন তথা বিচারব্যবস্থার তথাকথিত 'নিরপেক্ষতা'র মুখোশ! ড: বিনায়ক সেনের বিচারকে ঘিরে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আবার আমরা দেখতে পেলাম।

ড: সেনের নামে প্রশাসনের অভিযোগ, তিনি নাকি 'মাওবাদী'দের সমর্থক, জেলে বন্দী 'মাওবাদী'দের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের চিঠি তিনি বাইরে চালান করতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এর আগে 'মাওবাদী' ছাপ্পা দিয়ে রাজনৈতিক কর্মী নারায়ন স্যান্যাল ও ব্যবসায়ী পিযুষ গুহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, যাঁরা বর্তমানে জেলে আছেন। অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে সেই নারায়ন স্যান্যাল ও পিযুষ গুহ'র মামলায় ড: বিনায়ক সেনকেও জড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে সহজে প্রমান করা যায় যে তিনিও 'মাওবাদী'। অথচ মজার ব্যাপার হলো, নারায়ন স্যান্যালের বিরুদ্ধে পুলিস যে-কটি ফৌজদারি মামলা করেছিল, তার একটাও আজ পর্যন্ত প্রমানিত হয়নি। একই কথা সত্যি পিযুষ গুহ-র মামলার ক্ষেত্রেও। সেক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে ড: বিনায়ক সেন 'অপরাধী' প্রমানিত হলেন কোন যুক্তিতে!

সরকার পক্ষ অভিযোগ করেছে, জেলে বন্দী নারায়ন স্যান্যাল মাওবাদী-পার্টিকে যেসমস্ত চিঠি-চাপাঠি লিখতেন, বিনায়ক সেন তা সংগ্রহ করে পৌঁছে দিতেন পিযুষ গুহকে। অথচ আদালতে হলফনামা দিয়ে খোদ জেল-কর্মচারীরাই জানিয়েছেন, নারায়ন স্যান্যাল ও বিনায়ক সেন-এর মধ্যে এ'রকম কোনো চিঠি চালাচালি হতে তাঁরা কখনো দেখেনইনি! এমনকি যে হোটেল গুলিতে পিযুষ গুহ বিভিন্ন সময় থেকেছেন, তার মালিকরাও আদালতে জানিয়েছেন যে পিযুষ গুহ-র ঘরে বিনায়ক সেনকে তাঁরা কখনো আসতেও দেখেননি। অথচ, রায় দেবার সময় বিচারপতি অদ্ভূত ভাবে নিরব রইলেন এইসমস্ত তথ্য সম্পর্কে!

শুধু তাই নয়, সরকারের চোখে 'আপত্তিকর', 'রাষ্ট্রদোহীতার বার্তাবাহক' যে তিনটি চিঠি পিযুষ গুহ-র কাছে পাওয়া গেছিল বলে পুলিশ দাবী করে (যেগুলি নাকি জেলে দেখা করতে যাবার সময় নারায়ন স্যান্যালের কাছ থেকে নিয়ে পিযুষ গুহকে পৌছে দেন বিনায়ক সেন), থানার রোজনামচায় অথবা এফ আই আর-এ কোথাও সেই তিনটি চিঠির কোনো উল্লেখ-ই ছিল না! এমনকি পিযুষ গুহকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তাঁর এরেস্ট মেমোয় স্বাক্ষরদানকারী সাক্ষী অনিল সিং-এর বয়ানেও এই তিনটি চিঠির কোনো উল্লেখ নেই! তাহলে কিসের ভিত্তিতে, কেনই বা বিনায়ক সেনকে গ্রেপ্তার করা হলো, আর কেনই বা নারায়ন সেনকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হলো -- তার কোনো ব্যাখ্যাই আদালত দিতে পারেনি।

পিযুষ গুহকে কোথা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আর সেই সময় তাঁর কাছ থেকে কি কি জিনিস পাওয়া গেছিল, তাই নিয়ে আদালতে পুলিশ-ই তিনবার তিনরকম গপ্প শুনিয়েছে। এরেস্ট মেমোয় লেখা ছিল পিযুষকে ধরা হয়েছে 'স্টেশন রোড' থেকে; সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা পিটিশনে বলা হয়েছে 'হোটেল মহিন্দ্র' থেকে; আর তদন্তকারী অফিসারের বয়ান অনুযায়ী 'গঞ্জ পুলিশ থানা' থেকে! পীযুষের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা নথি সংক্রান্ত নানান গলদও বার বার আদালতের নজরে আনেন পীযুষের আইনজীবী। কিন্তু কোনো কিছুতেই বিচারক কর্ণপাত করেননি!

মামলা চলার সময় স্থানীয় পুলিশকর্মীরা সাজানো সাক্ষ্য দিয়েছিল, বিনায়ক সেন আর নারায়ন স্যান্যাল নাকি জঙ্গলে গিয়ে নকশালদের সাথে সভা করেন। অথচ জেরার সময় এই পুলিশকর্মীরা স্বীকার করে, ঘটনাটি তাঁরা 'দেখেননি' ... 'শুনেছেন' মাত্র! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক এই ধরনের 'শোনা কথা'র কোনো গুরুত্বই আইনে নেই; অথচ বিচারের সময় এই 'শোনা কথা'কেই বেদবাক্য বলে মেনে নিলেন বিচারপতি!

শুনানির চূড়ান্ত পর্বে বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে আর একটি 'অকাট্য প্রমান' আদালতে পেশ করে পুলিশ। কি সেই প্রমান? সেটি হলো একটি চিঠি, যা নাকি 'নামবিহীন কোনো মাওবাদীরা' লিখেছেন বিনায়ক সেনকে! কোথায় পাওয়া গেল চিঠিটা? বিনায়ক সেনের কম্প্যুটার থেকে। অথচ অন্য সমস্ত বাজেয়াপ্ত নথিপত্রে ড: সেনের স্বাক্ষর থাকলেও এই চিঠির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো স্বাক্ষর নেই। এমনকি তদন্তকারী কোনো অফিসারেরও স্বাক্ষর নেই! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক এই ধরনের কোনো বেনামী চিঠিকে আদালতে কখনই 'প্রমান' হিসাবে দাখিল করা যায় না। অথচ এই চিঠিটিকেই বেমালুম 'অকাট্য প্রমান' হিসেবে মেনে নিলেন বিচারপতি!

বিনায়ক সেন মামলায় এ'রকম অজস্র বেনিয়মের ছড়াছড়ি —যা দেখে মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে— কারাদন্ড দেওয়াটা 'পূর্বনির্ধারিত'ই ছিল — তার আগে বিচারের নামে কেবল একটা প্রহসন হয়েছে মাত্র! আর এই প্রহসন কেবল আজ নয়, যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। কখনো সে সব ঘটনা সর্বসমক্ষে আসে, আবার কখনো বা স্রেফ ধামাচাপা পড়ে যায়। বিনায়ক সেনের মতো আরও অনেকে, যখনি সোচ্চার হয়েছেন রাষ্ট্রের চোখরাঙানির বিরুদ্ধে, তখনই 'দেশদ্রোহী' তকমা দিয়ে, গ্রেপ্তার করে জেলে ভরে রেখে চেষ্টা করা হয়েছে তাঁদের কন্ঠরোধ করার। ব্রিটিশরা 'স্বদেশী'দের বিরুদ্ধে একটা সময় যে কৌশল নিত, দেশ 'স্বাধীন' হওয়ার পরও সেই একই কৌশল চলে আসছে রাষ্ট্রের চোখে 'বেয়াড়া' লোকেদের শাস্তি দিতে। আশার কথা, প্রতিবাদী একটা কন্ঠকে চুপ করিয়ে রাখার রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে আরও বেশ কিছু প্রতিবাদী কন্ঠস্বর সরব হচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেনীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
যোগাযোগ : ৩৬/২, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : +৯১-৯৪৩৩২৪২৪৯৮, ইমেল : shramikshakti@gmail.com

২০১০ — একটা দুর্নীতির বছর

শমীক চক্রবর্তী

২০১০ সাল পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম ২০১১ তে। রাজ্য রাজনীতিতে বিগত পর্যায় জুড়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-গোর্খাল্যান্ডের ঘটনাপ্রবাহ গণ-আন্দোলনের যে মাত্রা তৈরী করেছিল, আপাতত তা সংসদীয় রাজনীতির ঘেরাটোপে আটকে গেছে। গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রের সরকার পাশ করে গেছে একের পর এক ভয়াবহ নীতি। এসইজেড আইন থেকে শুরু করে বীজ বিল, পরমানু চুক্তি থেকে শুরু করে একেআই— দেশিবিদেশি মালিকদের জন্য পোয়াবারো সব ব্যবস্থা। সে তখন কেন্দ্রে ইউপিএ-১ সরকার থাকুক বা ইউপিই-২, কংগ্রেসের সরকার গঠনে মদত দিয়ে থাকুক সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেস— সব জমানাতেই পরিস্থিতি একই থেকেছে, লোকদেখানো দু-একটা গোঁসা করা ছাড়া।

২০০৯ সালে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসে ইউপিএ সরকার। বড় বড় রাঘব বোয়ালের দল কংগ্রেস গত এক বছর ধরে একের পর এক দেখিয়ে দিয়েছে তাদের স্বরূপ, ম্লান হয়ে গেছে ক্লীন ইমেজ আর আম আদমির সরকারের গল্পকথা গুলো। নতুন বছরের শোষণের ঘানি আর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিরসংঘর্ষের অমলিন সংগ্রাম শুরুর আগে একবার তাই ফিরে দেখা যাক গত একবছরের শাসকদের কিস্যাগুলোকে। ভারতের সর্বকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি দিয়ে সেই সাতকাহন শুরু করা যাক।

২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি

গাড়ি চলার জন্য যেমন রাস্তার দরকার হয়, তেমনই আমরা যে মোবাইলে কথা বলি তার জন্য একটি নেটওয়ার্কের দরকার হয়। মোবাইলের সিগনাল চলার জন্য এই দ্বিতীয় প্রজন্মের (২ জি) নেটওয়ার্ককেই বলা হয় ২জি স্পেকট্রাম। বিভিন্ন বহিরাগত কোম্পানি এবং বিভিন্ন দেশী কোম্পানি গুলোকে সরকার পয়সার বিনিময়ে এই স্পেকট্রাম ভাড়া দেয়। ২০০৭-০৮ সালে ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ পন্থায় টু-জি স্পেকট্রাম টেলিকম লাইসেন্স প্রদান করা হয়। যে ভাড়ার বিনিময়ে স্পেকট্রাম ভাড়া দেওয়া উচিৎ ছিলো তার থেকে অনেক অনেক কম পয়সায়, কর্পোরেট লবির সাথে যোগসাজসে টেলিকম দপ্তর থেকে ২জি স্পেকট্রাম এর লাইসেন্স ন্যূনতম মূল্যে ‘পছন্দের’ সংস্থাদের দিয়ে দেওয়া হয় কোটি কোটি টাকার কাটমানির পরিবর্তে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে টেলিকম অপারেটরদের লাইসেন্স দেওয়ায় সরকার ৩৯০০ কোটি ডলার (পৌনে দুই ট্রিলিয়ন টাকা) জাতীয় আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন ইউনিটেক ইউনিট, সোয়ান টেলিকম, রিলায়েন্স কম, টাটা টেলি সার্ভিসসহ ৭টি মোবাইল অপারেটরকে লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়া হয়। এই খাতে ইউনিটেক এবং সোয়ান টেলিকমের আর্থিক সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার শর্ত পর্যন্ত পূরণ হয়নি। রিলায়েন্স কম এবং টাটা টেলি সার্ভিসকে দেওয়া হয়েছে বিপুল অংকের সুবিধা। ১ লাখ ৭৬ হাজার কোটি টাকার ২জি স্পেকট্রাম দুর্নীতিতে শরিক দল ডিএমকের টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা ও তার টেলিকম মন্ত্রকের কর্তাব্যক্তিরা ছাড়াও নাম জড়িয়ে পড়েছে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি কন্যা কানিমোজি, কর্পোরেট লবিস্ট নীরা রাডিয়া ও চেন্নাইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবি সংস্থার নামও। যে বোফর্স কেলেঙ্কারির জন্য রাজীব গান্ধীকে ক্ষমতা হারাতে হয়েছিল, সেই আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ছিল ২৫ মিলিয়ন ডলার। বহু আলোচিত বিহারের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ছিল ২৫০ মিলিয়ন ডলার। তাই দেখা যাচ্ছে, ভারতের ইতিহাসে এ টেলিযোগাযোগ খাতের দুর্নীতি সবচেয়ে বড় দুর্নীতির ঘটনা।

কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি

অক্টোবরের ৩ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ গেমস। শুধু যে এই গেমসের আয়োজনের পরিধিই বড় ছিল তা নয়, এতে ব্যয় হয়েছে ৭ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার। গেমসে অংশ নেয় ৭১টি দেশ। ২০০3 সালে দরকষাকষি করে কমনওয়েলথ গেমস এদেশে নিয়ে আসার সময় আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছিল ১৮৯৯ টাকা। কিন্তু এই ২০১০-এ এসে কমনওয়েলথ গেমসে বাস্তবত মোট খরচ দাঁড়িয়েছে ৭০,০০০ কোটি টাকা। ২০০৬ সালে মেলবোর্নে কমনওয়েলথ গেমস করতে গিয়ে যা খরচা হয়, এই খরচটা তার ১৪ গুণ! এমনকি অনুন্নত-বঞ্চিত মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত ৭০০ কোটি টাকাও ঘুরিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এই খাতে। কমনওয়েলথ গেমসে ‘লাগামছাড়া দুর্নীতি’ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে এমনকি সুপ্রিম কোর্টও। দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের কাছে গেমস উপলক্ষে ১০ কোটিরও বেশি টাকা খরচে বানানো একটি ফুটব্রিজ ভেঙে পড়েছিল। কমনওয়েলথ গেমস শুরুর আগে থেকেই এই পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি সামনে আসতে শুরু করে। ভেন্যু তৈরিতে নিম্নমানের জিনিসপত্র ব্যবহার, এ্যাথলিট ‘ভিলেজ’-এর নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, এই সব কিছু নিয়ে গেমস শুরুর আগেই বিশ্বব্যাপি ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। গোটা শহরজুড়ে এই কর্মযজ্ঞের জন্য ভয়াবহ রকম কম পয়সা দিয়ে শ্রমিকদের কাজ করানো হয়। মুনাফা লুটেছেন ঠিকাদাররা। শুধু শ্রমিকদের ঠকানোর এই পরিমাণটাই ৩৬০ কোটি টাকা! হিসেব বলছে, সমস্ত জিনিস বা পরিষেবা কেনার জন্য খরচের হিসেব গড়ে ৩০% করে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। যাবতীয় ক্রয় বা আমদানি, ভূয়ো সংস্থাকে ভুতুড়ে বিল প্রদান, ছোটখাটো অজানা সংস্থাকে প্রচুর খরচের বরাত, এবং গেমসের অফিসে বারবার ‘ডাকাতি’র ফলে বারবার হিসেবের কাগজপত্র হাপিস—জনগণের করের টাকায় এই মোচ্ছবকে ‘কমনের’ (আমজনতার) ‘ওয়েলথ’ নিয়ে নয়ছয় বলেই দেখেছে মানুষ।

কংগ্রেস তার সাংসদ এবং কমনওয়েলথ অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান সুরেশ কালমাদিকে ছেঁটে দেয় ঠিকই, কিন্তু তার বেশি কিছু হয়নি। একেবারে যাকে বলে, খেল খতম পয়সা হজম!

আদর্শ হাউসিং কেলেঙ্কারি

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁর দু’বছরও অতিবাহিত হয়নি কংগ্রেসের অশোক চহ্বাণের। এর মধ্যেই দুর্নীতির অভিযোগ। কার্গিল যুদ্ধে নিহত সেনা অফিসারদের বিধবাদের জন্য নির্মিত আবাসনে তাঁর আত্মীয়দের নামে চারটি ফ্ল্যাটের বন্দোবস্ত করেছেন তিনি। মুম্বইয়ের কোলাবায় সমুদ্র তটবর্তী এলাকায় সংশ্লিষ্ট জমিটি নিহত সেনা জওয়ানদের বিধবাদের আবাসনের জন্য একদা চিহ্নিত করা হয়েছিল। আদর্শ সোসাইটি নামে ওই আবাসন গোড়ায় ১৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু চহ্বাণ যখন মহারাষ্ট্রে রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন, তখন বাড়িটি ৩১ তলা পর্যন্ত করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আবাসনটির চল্লিশ শতাংশ ফ্ল্যাট সাধারণ নাগরিকদের বিক্রির ছাড়পত্রও দেওয়া হয়। আর তার পরেই এই তথ্য বেরিয়ে পড়ে যে ওই আবাসনে চহ্বাণের চার আত্মীয়ের ফ্ল্যাট রয়েছে। এর মধ্যে চহ্বাণের শাশুড়ি ভগবতী শর্মার নামেও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। ছ’মাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগের আঙুল ওঠে প্রাক্তন সেনাপ্রধান দীপক কপূরের বিরুদ্ধে। ওই আবাসনের ফ্ল্যাট তিনি ফিরিয়ে দিলেও, তাঁর বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগ জমা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দিল্লি ও গুড়গাঁওয়ে হিসেব বহির্ভূত সম্পত্তি কেনা, তা-ও চুক্তিতে কারচুপির মাধ্যমে। সেনাপ্রধান হিসেবে তাঁর মেয়াদের শেষ পর্বে শিলিগুড়ি লাগোয়া সুকনা-জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত সেনা-কর্তার বিরুদ্ধে ‘নরম’ অবস্থান নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই দীপক কপূরের বিরুদ্ধে। মহারাষ্ট্র নগরোন্নয়ন দফতর থেকে তার পর লোপাট হয়ে যায় আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নথি। তদন্তের জন্য তথ্য হিসেবে নগরোন্নয়ন দফতর সিবিআইকে দশটি ফাইল দিয়েছিল। সে সময় দেখা যায়, তার ভিতরে বেশ কয়েকটি নথি নেই। আদর্শকে দেওয়া পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রে বেশ কিছু ফাঁক রয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। আদর্শকে জায়গা দিতে সরকারি রাস্তার প্রস্থও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত মুখরক্ষা করতে অশোক চহ্বাণকে পদত্যাগ করিয়ে দেয়।

আইপিএল কেলেঙ্কারি

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের (আইপিএল) যাত্রা শুরু ২০০৮ সালে। অথচ এরই মধ্যে আইপিএলকে কেন্দ্র করে অনেক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অভিযোগ দানা বেঁধে উঠেছে। খোদ আয়োজক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বলিউড তারকাদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, ম্যাচ গড়াপেটাও ও বেটিংসহ গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শশী থারুর ও তার বান্ধবী সুনন্দা পুষ্করকে কেন্দ্র করে উঠতে শুরু করে আইপিএল দুনিয়ার অন্তরালের পর্দা। আলোচনা-সমালোচনা জের হিসেবে শশী থারুর মন্ত্রিত্ব ছাড়তে বাধ্য হন। আইপিএল সাম্রাজ্যের বিতর্কিত নায়ক ললিত মোদিকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মোদি তাঁর পদ ছাড়তে নারাজ ছিলেন। তিনি হুমকি দিচ্ছিলেন যে, তাঁকে পদত্যাগ করতে হলে অনেকের পর্দার আড়ালের রূপটা বেরিয়ে আসবে। বলিউড তারকা শাহরুখ খান, প্রীতি জিন্টা, শিল্পা শেঠি ও বিজয় মালিয়া ললিত মোদির প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। মোদির সবচেয়ে বড় সহচর শারদ পাওয়ার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক নেতা এবং কেন্দ্রের পূর্ণ মন্ত্রী। এছাড়াও আইপিএলের নিলামের আগে এনসিপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক ও কর্পোরেট জগতের অনেক রাঘববোয়ালই জড়িত আইপিএল কেলেঙ্কারির সঙ্গে। আইপিএলকে কেন্দ্র গত তিন বছরে শত শত কোটি টাকা উড়েছে। আইপিএল-কে কেন্দ্র করে বেটিং, কালো টাকার লেনদেন, হাওলার মাধ্যমে অর্থ লেনদেন- সবই হচ্ছে। জানা যায় দেশী-বিদেশী ৭৩টি কোম্পানি আইপিএল ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করছে নানা পথে, নানাভাবে। এর মধ্যে অনেক কোম্পানি মরিশাস, বাহামা, হংকং ইত্যাদি তথাকথিত করহীন স্বর্গরাজ্যের দেশে নিবন্ধিত। এসব কোম্পানিতে কারা অর্থ বিনিয়োগ করছে, কি পরিমাণ কালো টাকা সাদা হচ্ছে, এসবই অজানা। খেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের তৈরি হওয়া আবেগ আইপিএল ব্যবসায়ীদের অন্যতম পুঁজি। ফলে আইপিএল দুর্নীতি মুক্তবাজার অর্থনীতির ফসল।

এভাবে তালিকা ধরে লিখতে থাকলে শেষ হওয়া মুশকিল। অভিযোগ এসেছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চপদস্থ অফিসাররা ঘুষ নিচ্ছেন কর্পোরেট লোন দেওয়ার জন্য। এই ঘুষের পরিমাণ কয়েক মিলিয়ন ডলার। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে এলআইসি হাউজিং ফিনান্সের চিফ এক্সিকিউটিভ, এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অফিসাররা।

দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে রাজ্যস্তরেও। কর্নাটকে জমি কেলেঙ্কারিতে নাম উঠে এসেছে বিজেপির ইয়েদুরাপ্পার সরকারের, যারা এখনও গদিতে বসে আছে বহাল তবিয়তে। এরাজ্যে রাজারহাট থেকে শুরু করে নানা ব্যাপারে অভিযোগ ভেসে বেড়াচ্ছে নেতাদের সম্পর্কে। উত্তরপ্রদেশে খাদ্য কেলেঙ্কারিও এপর্যায়ে বড় কেলেঙ্কারি। এর পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেরালে এরকম অনেক বেড়াল ঝুলি থেকে বেরোবে।

এখন মুশকিল হল, এসব দুর্নীতি হতে হতে খানিকটা গা-সওয়াও হয়ে গেছে মানুষ। কারণ শ্রমজীবী মানুষের কোন সংগঠিত শক্তি না থাকার ফলে যেটুকু প্রতিবাদ-বিক্ষোভ— সবই আবদ্ধ হয়ে গেছে ভোটে ফায়দা লোটার রসদে। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইও হয় হিসেব কষে। সংসদ অচল হয়ে যাওয়া, ‘বাম’ ও বিজেপিদের লোকদেখানো প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু সেসবই আগামী ভোটকে লক্ষ্য রেখে, জনগণের টাকা নিয়ে এই বিপুল নয়ছয় নিয়ে তাদের সত্যিকারের কোন হেলদোল নেই। থাকবেই বা কি করে? তারা প্রত্যেকেই তো কোন না কোন সময়ে, এখনো কোন না কোন রাজ্যে সরকারে আসীন হয়ে একইরকমভাবে দুর্নীতির অংশীদার।

নতুন বছর, নতুন দশক এই দগদগে স্মৃতি নিয়েই শুরু করছে তার পথচলা। সমস্ত অশুভ আঁতাতের মুখোশগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে, সামনে আসবে কি জনগণের শত্রুরা? দাঁড়াবে কি জনতার কাঠগড়ায়? আমজনতার হিম্মতই ঠিক করবে কি আমাদের ভবিষ্যত।

সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থার দফারফা হাল, হাসপাতাল নিয়ে আন্দোলন

দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন হাসপাতাল

বেসরকারিকরনের দিকে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতা উপকণ্ঠে বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরী হওয়ায় সংলগ্ন অঞ্চল এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষ অল্প খরচে সুচিকিৎসা পাওয়ার আশা দেখেছিলেন। কাছাকাছি একমাত্র সরকারী হাসপাতাল হচ্ছে এম.আর বাঙ্গুর হাসপাতাল। সেখানে অসংখ্য রোগীর উপচানো ভিড়, ডাক্তাররা হিমশিম খান এত রোগীর চিকিৎসা করতে। ফলে বাঘাযতীন হাসপাতাল হওয়ায় অপেক্ষাকৃত সহজে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন ভেবে স্বস্তি পেয়েছিলেন এলাকার মানুষ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি যে, সে আশা পুরন হয়নি। যাদবপুর নাগরিক উদ্যোগ সংগঠনের পক্ষ থেকে এবিষয়ে বিগত কয়েক মাস ধরে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। গত মে মাসে এক গণকনভেনশনের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন সূচিত হয় এবং তারপর তথ্যসংগ্রহ, গণস্বাক্ষর, এলাকায় প্রচার সহ নানা কর্মসূচী চলেছে।

বাঘাযতীন হাসপাতালে সঠিক মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়না, বা দরকারী ওষুধপত্র, অপরিহার্য পরীক্ষানিরীক্ষা ব্যবস্থার থাকার কথা থাকা সত্ত্বেও প্রায় কোন কিছুই পাওয়া যায়না, স্থানীয় মানুষের এই অভিযোগের ভিত্তিতে তারা হাসপাতালের সামনে দিনের পর দিন তথ্য সংগ্রহ করে। এবং এই তথ্যেও একই সত্য বেরিয়ে আসে। অথচ, তথ্য জানার অধিকার আইনের সাহায্যে জানা যায় যে, এই হাসপাতালে সব ধরণের চিকিৎসা ও পরীক্ষানিরীক্ষা হওয়ার কথা। অর্থাৎ যথার্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া যাদের দায়িত্ব, তাদের উদাসীনতা এবং অবহেলাই যে বাঘাযতীন হাসপাতালের এই দৈন্যদশার কারণ, সেটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। অথচ রয়েছে বিরাট বিল্ডিং এবং অন্যান্য পরিকাঠামো, বেতন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগার থেকে।

একইসঙ্গে দাবী তোলা হয় কোন অজুহাতেই এই হাসপাতালকে বেসরকারী কোন স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়া চলবে না যেমনটি করা হয়েছে যাদবপুর টিবি হস্পিতালকে প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী কেপিসি গ্রুপের হাতে তুলে দিয়ে।

গত ২৪ ডিসেম্বর হাসপাতালের গেটে এলাকার মানুষদের নিয়ে জমায়েত হয়ে সুপারের কাছে ডেপুটেশন ও স্বাক্ষর সহ দাবিপত্রও পেশ করে নাগরিক উদ্যোগ।

তাদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে কিছু সাফল্য এসেছে। হাসপাতালে নিয়মিত রক্ত-মল-মূত্র এবং কফ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো হত না, বর্তমানে, সুপারের কথা অনুযায়ী এগুলি হচ্ছে। এক্সরে, ইসিজি, আলট্রাসাউন্ড হত না, বর্তমানে হচ্ছে। জেনারেটর সারানো হয়েছে। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না— এই অভিযোগের জবাবে সুপারের বক্তব্য হচ্ছে: সব ওষুধ স্বাস্থ্য দপ্তর দিচ্ছে না, আবার যে ওষুধ দিচ্ছে সেটা অনেক সময় কার্যকর হচ্ছে না, অসুখ সরানোর জন্য ডাক্তাররা বাধ্য হচ্ছেন অন্য ভালো ওষুধ প্রেস্ক্রাইব করতে যা বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে।

ডাক্তাররা সময়মত দপ্তরে থাকেন না এমনকি জরুরী বিভাগেও সব সময় তাদেরকে পাওয়া যায় না— এই অভিযোগ সুপার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এর জন্য ডাক্তারের অভাব এবং একাংশ ডাক্তারের অসহযোগিতার কথা বলেছেন। আন্দোলনকারীরা দাবী করে, ডাক্তারের অভাব পূরণ করার দায়িত্ব সুপারকেই নিতে হবে। ডাক্তারদের কেউ অসহযোগিতা করলে তা মেটানোর দায়িত্বও ওনার, এর জন্য কোন রোগী চিকিৎসা পাবে না, এটা বরদাস্ত করা হবে না।

এই হাসপাতালে সার্জারি অর্থাৎ অপারেশন হওয়ার কথা। মাইক্রোসার্জারি, ল্যাপারোস্কপি, চক্ষু অপারেশন— সব হওয়ার কথা অথচ কিছুই হয়না, এই অভিযোগের উত্তরে সুপার বলেছেন, সব ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও চক্ষু বিশেষজ্ঞ, এ্যানাস্থেসিস্ট এবং গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাবে সার্জিকাল বিভাগ অকেজো হয়ে আছে, সরকারের কাছে বারবার চিঠি লিখে ডাক্তার, এ্যানাস্থেসিস্ট এবং গ্রুপ-ডি কর্মী চাওয়া সত্ত্বেও পাওয়া যাচ্ছে না।

হাসপাতালে রোগীদের খাদ্য আসে বাইরে ক্যাটারার থেকে অথচ খাদ্যের গুণমান তদারকির কোন ব্যবস্থা নেই।

এই হাসপাতালের বেসমেন্ট-এ ১৬ টি হাসপাতালের রোগীদের জামাকাপড়-চাদর প্রভৃতি কাচা হয়, সে জায়গাটি অত্যন্ত অপরিষ্কার ফলে প্রভূত দুষণ তৈরী করছে যা রোগীদের অসুখ সারানোর বদলে বাড়িয়ে দেবে। তদুপরি সরকারী হাসপাতালের এই কাজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাইভেট 'ব্যান্ড বক্স'কে। এটা প্রাইভেটাইজেশনের দিকে একটা পদক্ষেপ বলে মনে করে তার প্রতিবাদ জানান নাগরিক উদ্যোগের প্রতিনিধিরা। সুপারের বক্তব্য হচ্ছে, তিনি সরকারী নির্দেশ পালন করছেন মাত্র, এবিষয়ে তার কিছু করার নেই।

দাবী মত সুপার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দপ্তর সহ ডাক্তারদের তালিকা, কোন ডাক্তার কবে এবং ক'টা পর্যন্ত দপ্তরে বসবেন, ওষুধের তালিকা, বেডের সংখ্যা এসব দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেবেন, যাতে সহজে সকলে এসব জানতে পারেন। অন্তর্বিভাগ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন।

কিন্তু সব থেকে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে— এই হাসপাতালকে ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেওয়ার নিশ্চিত চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই তিনটি প্রাইভেট পার্টি এসেছে হাসপাতাল পরিদর্শনে, সরকারী অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে। তৃতীয় জন ব্যাঙ্গালোর ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী। মাপজোকও হয়ে গেছে। সরকারী হাসপাতাল তুলে দিয়ে এখানে হবে নিউরো-ফেসিয়াল ক্লিনিক। অর্থাৎ কসমেটিক ট্রিটমেন্টের সাহায্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং কোঁচকানো চামড়া টানটান করার পশ্চিমী ব্যবস্থার আমদানি করে ব্যাপক মুনাফা লোটার নোংরা পরিকল্পনা।

এটা হলে সম্পূর্ণভাবে বাঘাযতীন-যাদবপুর অঞ্চল এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করবে, ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু এই মানুষ-বিরোধী ষড়যন্ত্রকে সফলভাবে বাধা দিতে গেলে চাই ব্যাপক মানুষের সম্মিলিত সদিচ্ছা এবং সংগ্রামী প্রতিরোধ। সেই বৃহত্তর আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছে যাদবপুর নাগরিক উদ্যোগ।

হাওড়ার বাউড়িয়ায়

ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০শে ডিসেম্বর মজদুর ক্রান্তি পরিষদের হাওড়া জেলা কমিটির নেতৃত্বে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে বাউরিয়ার ফোর্ট গ্লস্টার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সুচিকিৎসার দাবিতে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই হাসপাতালটি দীর্ঘ প্রায় ২০-২৫ বছর ধরে চালু হলেও এই হাসপাতালে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরী করা হয়নি। বিরাট হাসপাতাল বিল্ডিং এবং স্টাফ কোয়ার্টার বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে অথচ নেই ওটি, শিশুবিভাগ, প্রসূতিবিভাগ, এক্সরে-প্যাথলজির ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরিষেবা যা একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে থাকার কথা। এমনকি বছর দুয়েক আগে এমকেপি যখন এই আন্দোলন শুরু করে তখন এই হাসপাতালে রোগীদের বাড়ি থেকে বেডিং নিয়ে আসতে বলা হল। বাথরুম, পায়খানা ছিল ব্যবহারের অযোগ্য। সর্বসাকুল্যে ডাক্তার ছিলেন তিনজন। তারা একেকজন পালা করে হাসপাতালে আসতেন। এমকেপি হাসপাতালের সুপারের কাছে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ অবস্থান, স্থানীয় মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহের মত নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। ফলে হাসপাতালের কিছু উন্নতি ঘটে কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। তাই সিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও সিএমওএইচ ঐদিন অফিসে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তার অফিস থেকে জানানো হয় তিনি জরুরী কাজে 'রাইটার্সের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে ব্যস্ত' থাকায় তিনি অফিসে এসে ডেপুটেশন নিতে পারছেন না। পরে এমকেপি নেতৃত্বের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে তিনি আলোচনায় বসবেন। সেইমত গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁর সাথে হাওড়া জেলা নেতৃত্বের আলোচনা হয়। সিএমওএইচ বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন। কেন একইসঙ্গে তৈরী হওয়া বেলুড় এবং গাববেড়িয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উক্ত নির্দিষ্টি পরিষেবাগুলি চালু হতে পারল অথচ ফোর্ট গ্লস্টার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে হতে পারলো না, তা তিনি অনুসন্ধান করবেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। মাসখানেক বাদে এবিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা বলেন।

এই নির্দিষ্টি পরিষেবাগুলি চালু করা এবং সুচিকিৎসার দাবিতে এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন হাওড়া জেলা নেতৃত্ব।

জয়নগরের মোয়া শ্রমিক

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

তাও মজুরিটা কোনভাবেই দিনে ১০০ টাকার বেশী নয়। অন্য পেশায় তাহলে দৈনিক রোজগারটা বুঝতে পারছেন তো? খাটুনিটা কম নয়— দুপুরের খাওয়া আর ঘন্টা খানেক রেস্ট নেওয়া বাদ দিয়ে সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা অব্দি কাজ। গুড় জ্বাল দেওয়া, বড় বড় কড়াইয়ে চিনি আর অন্য গুড় মিশিয়ে ভেজাল রস তৈরী করা, তারপর খই ফেলে উনুনেই নেড়ে নেড়ে মাখিয়ে মুড়কি বানানো— খুঁটি নাড়া দেখলেই বোঝা যায়— সকাল থেকে রাত— একেক বারে ১৫ কেজি মুড়কি— দিনের শেষে অন্তত ১০ কুইন্টাল মোয়া। বাপরে বাপ!

এরপর মুড়কির সাথে গুড় আর ক্ষীর মিশিয়ে ঘি দিয়ে পাকানোর কাজে মহিলারা বেশী পারদর্শী। এদেরও কাজ একই সময়ের— সকাল থেকে রাত। প্রত্যেকে ১৫ কেজির দশটা করে শেষ করে একেক দিনে, মানে দেড়শো কেজি করে দিনে, আর দিনে ৮০ টাকা। সার দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে পিঁড়ের ওপর প্রায় উবু হয়ে বসে সারাদিন মোয়া পাকানো। অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হাত-ঘাড়-কোমরে ব্যাথা আর বদহজম। সকালে সাতটায় আসার আগে ঘরের কাজ খানিক সামলানো, দুপুরে দু ঘন্টার জন্য বাড়ি গিয়েও খাওয়া ছাড়া থেকে যায় কিছু কাজ। সারা বছর এনারা কী করেন? জিজ্ঞাসা করলাম ভারতী দাসকে। 'ঢেঁড়স কাটি'। ঘাবড়াবেন না, আমিও ঘাবড়েছিলাম। বাড়ির সামান্য জমিতে সবজি চাষ করেন, আর অন্যের জমিতে ফসল কাটেন। জয়নগরের আশপাশের গ্রামগুলোতে ঢেঁড়স চাষের একটা হিড়িক দেখা যাচ্ছে গত এক দশকে; সার দেওয়া স্বাদবিহীন লম্বা-চওড়া 'বিলিতি জাতের' ঢেঁড়স, রূপ আছে কিন্তু গুন নেই। কেউ কেউ আবার অন্য সময়ে গৃহ পরিচারিকা, বাবুর বাড়ি রান্না বা আয়ার কাজ করেন, চন্দ্রপুলির সিজনে চন্দ্রপুলি।

কর্মশালায় সবচেয়ে বেশী লাগে প্যাকিং-এর লোক। বাক্স তৈরী, বাক্সয় নির্দিষ্ট সংখ্যক মোয়া ভরা আর রঙিন সুতো দিয়ে বাঁধা। এদেরও সারাদিন বসে বসে কাজ, বয়েসে হয় কিশোর কিশোরী না হলে বৃদ্ধ। অদক্ষ শ্রম। কিশোররা অন্য সময়ে বেকার, না হলে ট্রেনের হকার কিংবা মুটেগিরি করে, এর বাগান পরিস্কার, ওর গাছের ডাবটা পেড়ে দেওয়া এই আর কি। এদের মাইনে আরও কম— পঞ্চাশ কি ষাট টাকা। আর আছে মাল ডেলিভারি দেওয়া, গুড়টা হাট থেকে কিনে আনা, খইটার কি অবস্থা দেখা, অমুক লোকটা কাজে এল না কেন, কিংবা কেউ না এলে প্রক্সি খেটে দেওয়া। এরাও ওরকম ষাট-সত্তর টাকা পায়।

মজুরি যতই কম হোক না কেন এটা তো বোঝা যাচ্ছে দেড়-দুই থেকে তিন হাজার টাকা মাস গেলে মজুরিও বছরে অন্য সময়ের পেশাগুলোয় পাওয়া যায় না— সরকার বা বড় পুঁজি নয়, আঞ্চলিক ছোট ছোট ক্যাপিটাল, মানে ধরুন ২ লাখ টাকা, ২৫/৩০ জনের একশো দিনের কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এখনো খেজুর গাছ এক জনের, হাঁড়ি আর একজনের তো গুড় বানায় অন্যজন, মোয়া বানায় কেউ আর বিক্রি করে নানান দোকান, খায় আমজনতা। নিজের নিজের কাজের জিনিসের মালিকানা তাদেরই। নিজের পুঁজি, নিজের খানিক খাটুনি আর কিছু কর্মচারীর অল্পবিস্তর শ্রম চুরি করে দিব্যি চলছে অর্থনীতির একদম মূলস্রোতে না চলা একটা মোটামুটি গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থা। যেভাবে মূলস্রোত নানাদিকে থাবা বসাচ্ছে জয়নগরের মোয়া কোনদিন রিলায়েন্সের মোয়া বা হলদিরাম জয়নগরের মোয়া হয়ে যাবে তাই আশঙ্কার, 'সারাবছর একই দামে(বেশী দামে) রঙিন প্যাকেটে'। আরে পাগলা দুনিয়ার লোককে খাওয়াবি কী করে? খেজুর গাছ যে কমছে, অলরেডি দশটা গাছে একশো হাঁড়ি।

জঙ্গলমহল এখন কেমন?

নিজস্ব প্রতিনিধি: পি চিদাম্বরমের চিঠির উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হার্মাদ শব্দের ব্যাখ্যা চেয়েছেন। হার্মাদ শব্দের ব্যাখ্যা বুদ্ধবাবুর অজানা থাকতে পারে তবে হার্মাদ সম্পর্কে জনগণের সম্যক উপলব্ধি আছে। চিদাম্বরমের কথাবার্তায় স্পষ্ট রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় তিনি চিঠি দিয়েছেন বটে তবে হার্মাদ ছাড়া যৌথবাহিনী যে তাদের কাঙ্খিত সাফল্য পাবে না এটা তিনি মনে করেন। যদিও তিনি হার্মাদ না বলে স্থানীয় মানুষ কথাটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাছাড়া কোন 'স্থানীয় মানুষ' অস্ত্র হাতে যৌথবাহিনীকে সাহায্য করছে তা আজ সকলেই জানে। এ কথার অর্থ বাচ্চা ছেলেও বোঝে যে চিদাম্বরমের সাথে বোঝাপড়া করেই বুদ্ধদেবরা হার্মাদদের জঙ্গলমহলে নামিয়েছেন। উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন। যৌথবাহিনী ও হার্মাদ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। যেমন বুদ্ধ-চিদাম্বরম। দুঁহু তরে দুঁহু কান্দে। গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে হার্মাদদের সন্ত্রাস বাড়ছে। যে যে এলাকায় তারা ঢুকছে মাওবাদীদের মত একই কায়দায় 'অপারেশন' চালাচ্ছে। জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের পক্ষে এখন বোঝা মুশকিল কোন অপারেশন কে করছে! কারাই বা রাতে মিটিংয়ে যেতে বলছে, রাতপাহারা দিতে বলছে আর কারাই বা চাঁদার জন্য ফতোয়া জারী করছে। যে সিপিএমের লোকেরা ক'দিন আগে জনগণের কমিটির দাদা হয়ে গেছিল তাদেরই কেউ কেউ জনগণের কমিটির লোকেদের পেটাচ্ছে বা পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছে এমন ঘটনাও ঘটছে। মাওবাদী রাজনীতির অবিমৃশ্যকারিতার কল্যাণে জঙ্গলমহলে এখন খুন করে লাল কালিতে একটা পোস্টার লিখে দিলেই সেটা মাওবাদীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। সাংবাদিকরাও সেভাবেই লিখতে অভ্যস্ত। কোন দাদা কখন কখন কার হয়ে খেলছেন, বোঝা মুশকিল।

জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের অবস্থা ভয়ঙ্কর। আতঙ্কে গ্রামের মানুষ রাতে ঘুমোতে পারেন না। সন্ধে হলেই চারদিক শুনশান। জিনিসপত্রের দাম আগুন। এদিকে গত দুবছর এই এলাকায় চাষ-আবাদ হয়নি বললেই চলে। বনধ অবরোধ লেগেই আছে। কাজ কাম প্রায় হচ্ছে না

বললেই চলে। সবসময় কাজে বেরনোও সম্ভব হচ্ছে না। যৌথবাহিনী এখন 'উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে'ও ক্যাম্প করা শুরু করেছে। লেখাপড়া তো শিকেয় উঠেছে। গ্রামের স্কুলগুলোতেও উপস্থিতি অত্যন্ত কম। ঘরেই থাকতে না পারলে আর লেখাপড়া হবে কী করে? কিছু কিছু গ্রাম আছে যেখানে রাতের বেলা পুরুষেরা ঘরেই থাকতে পারে না। মহিলাদের রাতের পর রাত আতঙ্কে কাটে।

পুলিশি অভিযানের প্রতিবাদে, গ্রামের ছেলেদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গ্রামের সাধারণ মানুষ কখনও কখনও মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, সংগঠিত বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এছাড়া নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটি নামে কয়েকটি বড় মিছিল সংগঠিত হয়েছে। কিছু কিছু মেয়েদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মহিলারা এসব মিছিলগুলিতে সমবেত হয়েছেন, কিন্তু সেগুলোরও পথরোধ করেছে যৌথবাহিনী। কখনও কখনও ভয় দেখিয়ে তাড়াও করেছে।

এদিকে জনগণের কমিটির ঘাড়ে ভর করে নিজেদের প্রভাব বাড়াচ্ছে তৃনমূল কংগ্রেস। জনগণের কমিটি 'গণ মিলিশিয়া' হয়ে যাওয়ার পর থেকে জনগণের গণ আন্দোলনের, গণ সমাবেশের কোন মঞ্চ নেই। নেতৃত্ব সব 'আন্ডারগ্রাউন্ডে'। প্রশাসনও চেয়েছে তাদেরকে গোপন ডেরায় পাঠাতে। কার্যত জনগণের কমিটি 'নিষিদ্ধ' সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এখন তাই যেকোন প্রকাশ্য সমাবেশ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূলের জনসভাতে 'জনগণের কমিটি'র কোন কোন এলাকা থেকে লোকসমাবেশ করা হচ্ছে। মাওবাদীদের কাছেও সম্ভবত প্রকাশ্য সমাবেশে তৃণমূল কংগ্রেসই ভরসা। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মতই লালগড় আন্দোলনেরও ফায়দা তুলে নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

মুখে যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের কথা বললেও তৃণমূল কিন্তু চায় জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনী অন্ততঃ নির্বাচন পর্যন্ত থাকুক। যৌথবাহিনী না থাকলে এই মুহুর্তে সুশান্ত-তপন-সুকুরদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না মমতাবাহিনী। শুভেন্দু অধিকারী দাপুটে নেতা হলেও তাঁর পূর্ব মেদিনীপুরের মত জোর পশ্চিম মেদিনীপুরে নেই। তাছাড়া চিদাম্বরমের ছাড়পত্র নিয়ে সশস্ত্রবাহিনী গঠনের প্রশ্নে দীপক সরকাররা অনেকটাই এগিয়ে গেছেন।

সবমিলিয়ে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে জঙ্গলমহল বা পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। সন্ত্রাসের আবহে দিন কাটছে নিরন্ন, দরিদ্র হাজার হাজার জঙ্গলমহলবাসীর। রাজনৈতিক ভবিষ্যত যাই হোক না কেন জঙ্গলমহলের মানুষের জীবনে তা কোন বৈপ্লবিক উত্তরণের পরিমন্ডল তৈরী করবে না আদৌ তেমন কিছু না ঘটে চরম প্রতিক্রিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছেন জঙ্গলমহলের বেবাক মানুষ।

ভূ-উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে

শুভ্রকেতন বসু

পৃথিবীর বড় কোম্পানী-মালিকদের আরও পুঁজি জমানো, ব্যবসাকে আরও আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তোলার মারণ খেলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জল, জঙ্গল, কৃষিজমি সহ জীবনের মূল উৎসগুলি। বড়লোকদের লোভী স্বেচ্ছাচারী জীবনের সীমাহীন চাহিদা মেটাতে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এমন নির্মম ভাবে নিঙরে বার করা হচ্ছে, যে তার ভার প্রকৃতি আর সহ্য করতে পারছে না। পরিবেশ দূষণ বিষয়টা তাই কিছু উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের গবেষনায় সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। দূষণ বিরোধী আন্দোলনটাও যদি নিরাপদ দুরত্বে থেকে কিছু ভালো কাজ করার মধ্যে আটকে থাকে, তবে মুশকিল। দূষণকে বুঝতে হবে শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে দাঁড়িয়েই। পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদের লড়াই (সে পুঁজি ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র যার হাতেই থাক না কেন) যদি দূষণ বিরোধী লড়াইয়ের সাথে মিলে মিশে না যায় তবে এই পৃথিবীর ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো আসার কথা শোনানো সত্যিই অসম্ভব। মালিকি আক্রমনের সামনে বুক ছিটিয়ে দাঁড়ানো "শ্রমিকশক্তির" পাঠকদের সামনে তাই ভূ-উষ্ণায়ন বা Global Warming নিয়ে এই আলোচনার অবতারণা। সীমাহীন পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্টি হওয়া এই ভূ-উষ্ণায়নের বিপদটা এতটাই মারাত্মক যে, আটকাতে না পারলে আগামী ৩০ কি ৪০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ মেহনতি মানুষের জীবনে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে, যে দুর্যোগের ভয়াবহতার কাছে ৭৬'এর মন্বন্তর বা এটম বোমায় বিধ্বস্ত জাপান ম্লান হয়ে যাবে।

ভূ-উষ্ণায়ন বিষয়টা কি? সোজা কথায় বলতে গেলে পৃথিবী আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাচ্ছে। এই গরম হয়ে ওঠাটা শিল্প বিপ্লবের পর থেকে অর্থাৎ গত প্রায় দু'শো বছর ধরে ক্রমশই বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে গত একশো বছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৭৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেড়েছে। এই লাইনটা পড়ে আপনি একটু হতাশ হতে পারেন। ১০০ বছরে যদি তাপমাত্রার গড়

এত সামান্য বেড়ে থাকে তাহলে এত ভয় পাওয়ার কি আছে। মালিকদের টাকায় চলা খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে বলা হয় ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ তাপমাত্রা খুব সামান্যই বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন। তারা বলছেন গড় তাপমাত্রা ওই ০.৭৪ ডিগ্রী বাড়াটা মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়। আজ থেকে প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে যখন পৃথিবীতে হিমযুগ ছিল, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা বরফে ঢাকা ছিল, তখন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এখনকার থেকে মাত্র ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম ছিল। এখনকার থেকে গড় তাপমাত্রা যদি আর ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়ে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বরফ গলে যাবে। আবহাওয়ায় এমন পরিবর্তন আসবে যা মানুষের সহ্যের বাইরে চলে যাবে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা মানব সভ্যতা যেভাবে চলছে তাতে ২০৪০ সালের মধ্যেই গড় তাপমাত্রা ওই ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেড়ে যেতে পারে।

ভূ-উষ্ণায়নের বিপদটা ঠিক কি?

পৃথিবীর পানীয় জলের একটা বড় অংশ পাহাড়ের চূড়ায় হিমবাহ হিসাবে আর উত্তর ও দক্ষিন মেরুতে বরফ হয়ে জমে আছে। পাহাড়ের চূড়ার হিমবাহ যদি সবটা গলে যায় তাহলে হিমবাহ থেকে নেমে আসা নদীগুলিতে প্রথমে ভয়াবহ বন্যা হবে, তারপর নদীগুলি শুকিয়ে যাবে। পানীয় জলের অভাব দেখা দেবে, চাষবাসও বন্ধ হয়ে যাবে। পূর্ব আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের হিমবাহ অর্ধেকের বেশী গলে গেছে। হিমালয় পর্বতের হিমবাহও গলছে। গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র এইসব নদীতে একসাথে প্রবল বন্যা হলে ও তারপর নদীগুলি শুকিয়ে গেলে দেশে যে বিপর্যয় নেমে আসবে তার কাছে হিরোশিমা-নাগাসাকি তুচ্ছ। মেরুপ্রদেশের বরফ যদি গলে তাহলে সেই বরফ গলা জল এসে পড়বে সমুদ্রে। মেরু প্রদেশে যে বিপুল বরফ জমে আছে তার সবটা যদি গলে যায় তাহলে সমুদ্রের জল এত বাড়বে যে বাংলাদেশ মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কার মত বহুদেশ জলের তলায় চলে যাবে। ভারতেরও সমুদ্রউপকূলের সমস্ত রাজ্য তলিয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দক্ষিন ২৪ পরগনার হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, বর্ধমানের এক অংশ সমুদ্রে ডুবে যাবে। অসংখ্য মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবেন। চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। আর এসবই হতে পারে মাত্র ৩০-৪০ বছরের মধ্যে। দক্ষিন মেরুর বরফ ক্রমশই গলছে। সেখানে দিগন্ত বিস্তৃত বরফের চাঙরে ইতিমধ্যেই বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। উত্তর মেরুর অবস্থাও একই রকম।

পৃথিবীতে বরফের উপরে যে সূর্যরশ্মি এসে পড়ে তার অনেকটাই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। বরফ গলে গেলে সেখানে পড়া সূর্যরশ্মির অনেকটাই মাটি বা জল শুষে নেবে, ফলে পৃথিবী আরো গরম হয়ে উঠবে। গড় তাপমাত্রা যদি আরও ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড সত্যিই বাড়ে তাহলে ধান গমের ফলন ভীষণ কমে যাবে। অনেক রকম রোগ জীবানু পোকা-মাকড় খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করবে, নানা রকম রোগের মহামারী দেখা দেবে। আর এসবই হতে পারে মাত্র ৩০-৪০ বছরের মধ্যে।

ভূ-উষ্ণায়ন হচ্ছে কেন?

দিনের বেলায় পৃথিবীতে সূর্যের যে তাপটা এসে পড়ে; রাত্রে পৃথিবী সেই তাপ মহাশূন্যে ছেড়ে দেয়।

শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় আম আদমির চালচিত্র

গৌতম সেনগুপ্ত

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সম্প্রতি ভারতের মোট জনসংখ্যার কোন অংশ কত আয় করেন তার একটা তালিকা প্রকাশ করেছে। তারা তালিকাটি প্রকাশ করেছে ক্রয় ক্ষমতার সমতার (purchase power parity) ভিত্তিতে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ভারতীয় জনসংখ্যাকে পাঁচটি অর্থনৈতিক বর্গে ভাগ করেছে। বর্গগুলি হল দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্য মধ্যবিত্ত, উছে মধ্যবিত্ত ও ধনী। দরিদ্রের আয়ের পরিমান মাথাপিছু ১০৩৫ টাকার কম। নিম্ন মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে এটা হল ১০৩৫ টাকা থেকে ২০৭০ টাকা। মধ্য মধ্যবিত্ত বর্গের আয়ের পরিমান মাথাপিছু ২০৭০ টাকা থেকে ৫১৭৭ টাকা। উছে মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় ৫১৭৭ টাকা থেকে ১০৩৫৪ টাকা। আর জনসংখ্যার সবথেকে ধনী অংশের মাথাপিছু আয় ১০৩৫৪ টাকার বেশী। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ৮৩ কোটি মানুষ দরিদ্র বর্গভুক্ত আর নিম্ন বর্গভুক্ত মানুষ আছেন সাড়ে ২২ কোটি। ৫ কোটি মানুষ আছেন মধ্য মধ্যবিত্ত বর্গে আর উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। ধনী বর্গভুক্ত মানুষের সংখ্যা মাত্র ১০ লক্ষ।

প্রথমেই বলা হয়েছে প্রতিবেদনটি তৈরী হয়েছে ক্রয় ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে। আমরা আমাদের আয়ের টাকা নিয়ে বাজারে যাই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য, জামাকাপড় ক্রয়ের জন্য। এগুলো কেনার পর অতিরিক্ত টাকা থাকলে তখন আসে অন্য ভোগ্য পণ্য বা সামগ্রী কেনার প্রশ্ন। এমনকি লেখাপড়া বা চিকিৎসার জন্য ব্যয়ের প্রশ্ন আসে এগুলির পরে। এবার আজকের বাজার দরের পরিপ্রেক্ষিতে মাথাপিছু ১০৩৫ টাকার কম আয়ের পরিবারগুলির জন্য কোনটা কেনা সম্ভব আর কোনটা কেনা অসম্ভব তা বোধকরি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জী ঘোষণা করেছেন বর্তমান আর্থিক বছরে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার হবে ৭ শতাংশের বেশী। আসলে গত দশ বছর ধরেই আমাদের দেশের আর্থিক অগ্রগতির হার ৫-৬ শতাংশের বেশী। আর এর ফলে যদি কেউ ভাবেন যে আমাদের দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমছে তাহলে তিনি অত্যন্ত ভুল ভাবছেন। ২০০৮ সালে দেওয়া বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারতে দৈনিক ৫০ টাকা খরচ করতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা ১৯৯০ সালে ছিল ৪৪ কোটি । আর ২০০৫ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৬ কোটি। আসলে আর্থিক বৃদ্ধির হারের সাথে দারিদ্র কমার কোন সম্পর্ক নেই। আরও খোলসা করে বললে আর্থিক প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করেন ভারতীয় জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। পৃথিবীর দরিদ্রতম জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ ভারতে বাস করত ১৯৯০ সালে। আর ২০০৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৩ শতাংশ।

১৯৯০ সালে চালু হওয়া নব্য উদারবাদী অর্থনীতির ফলে বড়ো আম্বানি অর্থাৎ মুকেশ আম্বানি ৪৫০০ কোটি টাকা খরচ করে মুম্বই শহরে বাড়ি বানান। আর আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের মানুষের আয়লায় দেড় বছর পরেও মাথায় পলিথিন ছাড়া আর কিছু জোটে না। ভারতের বড় শহরগুলোতে ফুটপাথের স্থায়ী বাসিন্দাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। জনগণনার তথ্য থেকে জনসংখ্যার এই অংশটিকে বাদ দিতে পারলেই পরিকল্পনাকাররা নিশ্চিন্ত হন।

এবার আসা যাক শ্রমজীবী মানুষের উপার্জন বা মজুরির প্রশ্নে। ২০০০ সালে মজুরি বিষয়ে আমাদের দেশের ১৭ টি রাজ্যে একটি সমীক্ষা হয়। এই সমীক্ষা অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত ন্যুনতম মজুরি পান ৭০ শতাংশ শ্রমিক হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ৩০.১ শতাংশ ও শহরে ৩০.৪ শতাংশ শ্রমিক সরকার নির্ধারিত মজুরি পায়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় গ্রামীন রোজগার যোজনা প্রকল্পে ন্যুনতম মজুরি ১১০ টাকা। এবার আজকের বাজার দরের সাথে ১১০ টাকা দৈনিক মজুরির তুলনা করলেই ফাঁকিটা ধরা পড়বে। তারপর আছে বছরভর কাজ না পাওয়ার সমস্যা। দিল্লিতে সম্প্রতি ঘোষিত সরকার নির্ধারিত ন্যুনতম মাসিক মজুরি হল অদক্ষ শ্রমিক ৫২৭২ টাকা, আধা-দক্ষ শ্রমিক ৫৮৫০ টাকা, ও দক্ষ শ্রমিক ৬৪৪৮ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের সরকার নির্ধারিত মাসিক মজুরি হল অদক্ষ শ্রমিক ৩৬৭১ টাকা, আধা দক্ষ শ্রমিক ৩৬৯৭ টাকা ও দক্ষ শ্রমিক ৩৮২৩ টাকা। আজকের বাজার দরের সাপেক্ষে এই মজুরিগুলি বিচার করলে বাস্তব অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। লেবার ব্যুরোর ২০০৯-১০ সালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২৮তি রাজ্যের ৩০০ টি জেলার শ্রমজীবী মানুষের ৮৫ শতাংশের কোন সামাজিক সুরক্ষা নেই। অর্থাৎ এদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, গ্র্যাচুইটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ইত্যাদি নেই।

নব্য উদারবাদী অর্থনীতির ২০ বছর বাদে 'আম আদমির' ভারতের এটাই আসল চিত্র। অর্থমন্ত্রী ঘোষিত ৭ শতাংশের বেশী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লভ্যাংশ ভোগ করে আম্বানির আর ভারতীয় জনসংখ্যার সাকুল্যে ৮-১০% মানুষ। আর সেইজন্য এদের সাথে ৯০ শতাংশ ভারতবাসীর ব্যবধান ঘোচানোর লড়াই-সংগ্রাম আজকের আশু কর্তব্য।

(তথ্যসূত্র: Times of India, kolkata এবং 'অনীক নভেম্বর'২০১০')

ভারতে 'লবিং'কে আইনি করার চেষ্টা!

বিশেষ প্রতিবেদন: কোটি কোটি ডলারের টেলিকম কোম্পানি ২জি স্পেকট্রামের সঙ্গে ভারতের পেশাদার লবিস্ট নীরা রাডিয়ার সম্পর্ক এবং তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের টেলিফোনে আলাপের টেপ প্রকাশিত হওয়ার পর লবিংয়ের বিষয়টি সামনে এসেছে। ভারতে এখনো এটিকে দুর্নীতি হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান শোষণ আর মুনাফার জেরে লবিং বিষয়টি দিন দিন 'ওপেন সিক্রেট' হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে শুরু করে পরমানু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ পাওয়ার জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে করপোরেট গ্রুপগুলো এখন অর্থের বিনিময়ে লবিস্ট বা তদবিরকারী নিয়োগ করছে। এসব লবিস্টদের কাজ হচ্ছে রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজ নিজ মক্কেলদের স্বার্থে কাজ বাগিয়ে আনা। নীরা রাডিয়ার 'বৈষ্ণবী কমিউনিকেশন' ভারতের টাটা ও আম্বানি শিল্প পরিবারের ব্যবসাসংক্রান্ত পরামর্শক হিসেবে তিনি কাজ করছেন। প্রকাশিত টেলিসংলাপের টেপে দেখা যায়, শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কূটনীতিকের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। কাকে টেলিকমমন্ত্রী বানালে ২জি স্পেকট্রামের স্বার্থ রক্ষা হবে, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। রাডিয়ার ওই কথোপকথনে করপোরেটদের ক্ষমতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের কথোপকথনে বেরিয়ে এসেছে করপোরেটদের প্রভাবে রাজনীতিকেরা ওই সব কোম্পানির হয়ে কাজ করে থাকেন।

আমেরিকাতে প্রতিবছর দু হাজার পেশাদার লবিস্টকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৯৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেসের ৪৩ শতাংশ সদস্য সরকারি দায়িত্ব ছেড়ে বেসরকারি লবিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ১৯০০ নিবন্ধিত লবিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন ১১ হাজার লবিস্ট। তাঁদের কাজ হলো, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের প্রভাবিত করে নিজ নিজ মক্কেলদের কাজ বাগিয়ে আনা। ভারতে একইভাবে লবিং বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলে একটা প্রচার শুরু হয়েছে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল থেকে। অর্থাৎ দুর্নীতি আটকানো নয়, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তলার পক্ষে সালিশী শুরু করেছেন এরা। সরকার ও দেশি বিদেশি মালিকদের বোঝাপড়া কী স্তরে আছে, এবং তা কীভাবে জনগণের স্বার্থের একেবারে বিপরীতে দাড়িয়ে নির্লজ্জ ভুমিকা পালন করছে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মুর্শিদাবাদ

মজদুর ক্রান্তি পরিষদের পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯-২২ ডিসেম্বর ২০১০ চারদিনব্যাপী পদযাত্রার আয়োজন করে মজদুর ক্রান্তি পরিষদ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি। শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন দাবীদাওয়াকে সামনে রেখে ভরতপুর ও পাচথুপি থেকে একযোগে ১৯ ডিসেম্বর পদযাত্রা শুরু হয়। শুরু হয় জেলার প্রায় ৫০ জন কর্মী এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষেরা পদযাত্রীদের সঙ্গে পথ হাটেন। পদযাত্রায় আওয়াজ ওঠে-'উন্নয়নের ধাপ্পা নয় মেহনতি মানুষের স্বার্থে উন্নয়ন করতে হবে', 'মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে', 'গ্রামীন মজুরদের সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করতে হবে', 'মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে', 'নদী ভাঙ্গন ও বন্যা প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে' ইত্যাদি। পদযাত্রার মাঝে মাঝে পথসভা করে বিভিন্ন গ্রামে বক্তব্য রাখা হয়। পদযাত্রা কান্দি শহর ঘুরে প্রায় ১২৭ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে ২২শে ডিসেম্বর দুপুর ১টা নাগাদ বহরমপুর পৌছায়। এখানে জেলাশাসকের কাছে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলাশাসক দপ্তরের সামনে একটি জনসভার মধ্যে দিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়।

গণহত্যা

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

না। ইদানীং একা একা গ্রামে আসতেন। ওই বাড়িতে সময় কাটিয়ে আবার চলে যেতেন। এ ভাবেই চলছিল। দোতলা জানালা দিয়ে বন্দুকের নল উঁচিয়ে বসে থাকতেন ওঁরা। রাতের দিকে কখনও শূন্যে গুলিও চালাতেন। বোমাও ফাটত। কেঁপে উঠত ঘুমিয়ে থাকা শিশু। ইদানীং বাড়ছিল অত্যাচারের সীমা। ওঁদের সঙ্গে রাত পাহারা দেওয়ার জন্য গ্রামের যুবকদের বলা হয়েছিল। অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে যায় ৬ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার বিকেলে। বৃহস্পতিবার গ্রামের যুবক থেকে বৃদ্ধ সবাইকে 'বৈঠকে' ডেকেছিলেন বহিরাগত যুবকেরা। গড়বেতা থেকে আসা এই যুবকের দল নেতাই গ্রামে ক্যাম্প করেছিল লালগড়ে দলের লোকাল কমিটির সদস্য অবনী সিংয়ের নেতৃত্বে। তাঁরা জানান, এ বার থেকে রাত পাহারা তো দিতেই হবে, তার সঙ্গে গ্রামের মানুষদের 'শরীরচর্চা' করতে হবে। বন্দুক চালাতেও শিখতে হবে। আপত্তি জানান গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার বিকেলেই জোর করে শরীরচর্চা শুরু করতে বলেন যুবকেরা। বৃদ্ধ থেকে যুবক অনেককে জোর করে ছোটানো হয়। ছুটতে গিয়ে অনেকে পড়ে গিয়ে চোট পান। ওই সময় কথা না শোনার জন্য গ্রামের কয়েক জন যুবক, এমনকী প্রৌঢ়কেও মারধর করা হয়। অজ্ঞান হয়ে যান এক যুবক। এই ঘটনায় আলোড়িত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা, বিশেষত গ্রামের মহিলারা। এত অত্যাচার, জোর করে অস্ত্র-প্রশিক্ষণ, শরীরচর্চা করানোর প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ নেতাই গ্রামের সে-ই বাড়ি ঘিরে ফেলেন গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রথমে বাদানুবাদ, পরে ধস্তাধস্তি। বহিরাগত যুবকের দল প্রথমে শূন্যে গুলি ছুড়ে ভয় দেখান। কিন্তু তাতে কাজ হয় না। দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে ছুটে আসে গুলি। একটি-দু'টি নয়, গুলি করা হয় নির্বিচারে। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিন জন। পরে লালগড়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মৃত্যু হয় দু'জনের। মেদিনীপুর হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও দু'জনের। আহত আরও বেশ কয়েক জন। উপর থেকে ছুটে আসা গুলির ঘায়ে গৃহবধূ সরস্বতী ঘোড়ই-এর মাথার একাংশ একেবারে উড়ে গিয়েছে। ২০ বছরের অরূপ পাত্রের মাথা থেকে বুক পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে রক্তে। মুখটা আলাদা করে চেনা যায়নি। সরাসরি গায়ে গুলি করার পর গ্রামবাসীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। যে যে দিকে পারেন পালিয়ে যান। ঘটনার পর সশস্ত্র যুবকের দলও এলাকা ছেড়ে দু'টি দলে ভাগ হয়ে পালিয়ে যায়। একটি দল গ্রাম-লাগোয়া কাঁসাই নদী পেরিয়ে চলে যায় বেলাটিকরির দিকে। অন্যটি পালপাড়ার দিকে। তখন বেলা প্রায় সাড়ে ১০টা। মাত্র তিন কিলোমিটার দূরের লালগড় থানা থেকে পুলিশ আসে আরও কয়েক ঘণ্টা পড়ে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন সমস্ত মানুষ। বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভে সামিল হন প্রতিবাদী জনতা। কিন্তু নন্দীগ্রামের গনহত্যার পর যেভাবে দলমতনির্বিশেষে মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এবার তাকে ছাপিয়ে গিয়ে সামনে আসতে শুরু করে তৃনমূল কংগ্রেসের দিক থেকে জনগণের গোটা বিক্ষোভকে দখল করে ভোটবাক্সে চালান করার চেষ্টা। তাই নেতাই গ্রামের বিক্ষোভরত মানুষরাও তাদের, লাশগুলোও তাদের— তৃণমূল আপাতত এই রাস্তায়। আর সিপিএম যথারীতি মিথ্যের পাহাড়ে। তারা তৃণমূল-মাওবাদী যোগসাজশের ও তাদের আক্রান্ত হওয়ার ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে, যা আর মানুষ বিশ্বাস করে না।

এই ঘটনার পর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি আবার সরগরম হয়ে উঠেছে, তার প্রধান দিকটা যদিও ভোট বাক্সে ভোট চালান করার লক্ষ্যে পরিচালিত। কিন্তু অবশ্যই গনতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে, শ্রমজীবী জনতাকে এই প্রতিবাদকে সংগঠিত করতে হবে শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের রাস্তায়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে

রেল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক লড়াই

সঞ্জয় পাঠক

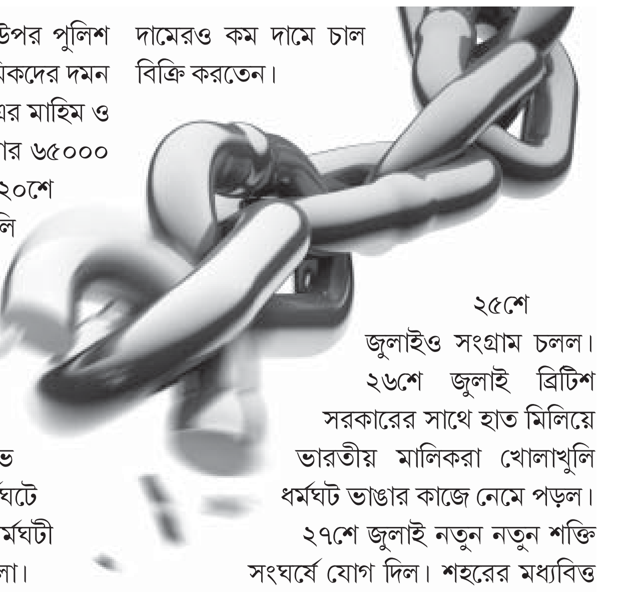

তাবড় তাবড় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আজ যখন কোনো রাজনৈতিক ধর্মঘটের ডাক দেয়, সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর কোন ভূমিকা থাকে না বললেই চলে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার লেজুড়ে পরিণত করেছে। তাই ধর্মঘট হলেও শ্রমিকরা থাকেন নিষ্ক্রিয়। অথচ আগে এমনটা ছিল না।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি শ্রমিকশ্রেণীর জন্মকাল থেকেই তারা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত না হয়েও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন।

কিন্তু রাজনৈতিক ধর্মঘট! হ্যাঁ, ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে বোম্বাই শহরে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

কেন বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন? কি ছিল তার পরিপ্রেক্ষিত?

১৯০৫ সাল ও তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। ঐ সময়ে বাংলা (অবিভক্ত) ও পাঞ্জাব জুড়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনও গড়ে ওঠে। এক কথায়, শ্রমিক-কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতম বিকাশ ঐ পর্যায় জুড়ে গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ বিরোধী ব্যাপক গণ আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী ঝোঁক ভারতীয় মালিকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস দলের মধ্যে ভারতীয় মালিকদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এই আতঙ্ক বা সংকটের প্রতিক্রিয়া সম্ভষ্ট হয়ে উঠল ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে। এই কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস 'মধ্যপন্থী' ও 'চরমপন্থী' এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তখন দেশ জুড়ে চলছিল বিদেশী দ্রব্য বয়কট করার তুমুল আন্দোলন। মধ্যপন্থীরা ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা বললেন এবং আন্দোলনে হিংসার পথ ছেড়ে সরকারের সাথে সহযোগিতার দাবি জানালেন। অন্যদিকে চরমপন্থীদের প্রদান নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। গণ আন্দোলনের বক্তব্য নিয়ে তিলক ও তাঁর অনুগামীরা শ্রমিকদের মধ্যে গেলেন এবং তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে শরিক করবার চেষ্টা করলেন। এর সাথে এটাও বলা দরকার যে, তারা এই কাজ কোনো উন্নত চেতনার বশবর্তী হয়ে করেননি। তাঁর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার জন্য তিলক শ্রমিকশ্রেণীকে একটি আলাদা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে সক্ষম হননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সময়ে মহারাষ্ট্রের জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর তিলকের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অসামান্য।

সেই সময়ে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন এবং বিভিন্ন জায়গায় অভ্যুত্থানে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এই আন্দোলন ঠেকাবার জন্য তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার মামলা সরকার লাগু করলেন। ১৯০৮ সালে ২৪ জুন তিলক গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে তিলকের ৬ বছর কারাদণ্ডের আদেশ হলো।

তিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়ে তুমুল গণ বিক্ষোভ সংগঠিত হলো। বিভিন্ন স্থানে জনগণ হরতাল সংগঠিত করলেন। এই সংগ্রামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মঘট পালন। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তার লেজুড় দেশীয় ঐতিহাসিকরা উভয়েই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ঘটনাকে চেপে দেবার চেষ্টা করেছে। কারণ, তারা শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সচেতন কার্যকলাপে মারাত্মক ভাবে ভীত ছিল। কিন্তু এদেশের বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশে এই রাজনৈতিক ধর্মঘটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

কিভাবে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক লড়াই-এ সামিল হলেন

তিলকের বিচার যখন চলছে, বোম্বাই-এর জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। শুরু হয় জনতার সঙ্গে পুলিশের সরাসরি সংঘর্ষ। প্রথম সংঘর্ষ ঘটে ২৯শে জুন। আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন হাজার হাজার মানুষ। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে এই অপেক্ষমান জনতার সংঘর্ষ হয়ে যায়। তারপর ১৩ই জুলাই থেকে যখন বিচার শুরু হয় তখন থেকে সেই সংঘর্ষ তীব্রতর রূপ ধারণ করে। ঐদিন সশস্ত্র ফৌজ বোম্বাই-এর রাস্তাগুলি ঘিরে রাখে যাতে কারখানা অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা কোর্ট পর্যন্ত না আসতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্ররোচনা উপেক্ষা করে ১৩ই জুলাই সকালবেলা গ্রিভস কটন অ্যান্ড মিলসের শ্রমিকরা ধর্মঘটে বেরিয়ে আসেন। সশস্ত্র ফৌজ শ্রমিকদের মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকার সেনা বাহিনী দিয়ে মিল অঞ্চলগুলিকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল যাতে শ্রমিকরা শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে না পারে।

১৪ই, ১৫ই, ১৬ই জুলাই একইভাবে আন্দোলন চলল। ১৭ই জুলাই শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ব্যাপকতর হলো। ঐ দিন দুপুরের পর, লক্ষ্মীদাস, গ্লোব, ক্রিমেন্ট, জামশেদ, নারায়ন, করিমভাই, মহম্মদভাই, ব্রিটানিয়া, ফিনিক্স, গ্রিভস, কটন অ্যান্ড কোং এবং আরো অনেকগুলি মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলেন। ব্রিটিশ বা ভারতীয় মালিকানাধীন উভয় ধরনের শিল্পের শ্রমিকরাই ধর্মঘট করলেন। ২০,০০০ শ্রমিকের এক দৃপ্ত মিছিল সমস্ত শিল্পাঞ্চল পরিক্রমা করে সমস্ত কারখানার শ্রমিকদের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসার আবেদন জানালো। ১৮ই জুলাই ও ঘটল একই ধরনের ঘটনা। কিন্তু পুলিশ চুপচাপ বসেছিল না। শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করল। কিন্তু শ্রমিকদের দমন করা গেল না। ১৯শে জুলাই বোম্বাই-এর মাহিম ও প্যারেল অঞ্চলের প্রায় ৬০টি কারখানার ৬৫০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলেন। ২০শে জুলাই শ্রমিকদের উপর আবার গুলি চলল। শ্রমিক শ্রেণীকে দমানো তখন কঠিন, এবার শিল্প শ্রমিকদের সাথে ডক শ্রমিকরা, ছোটখাট ব্যবসাদার, দোকান ও বাজারের সাধারণ মানুষরাও সংগ্রামে সামিল হলেন। ২১শে জুলাই ধর্মঘট আরো বিস্তার লাভ করল। ডকের ১ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ২২শে জুলাই ৫ জন ধর্মঘটী শ্রমিকের বিচার করে সাজা দেওয়া হলো।

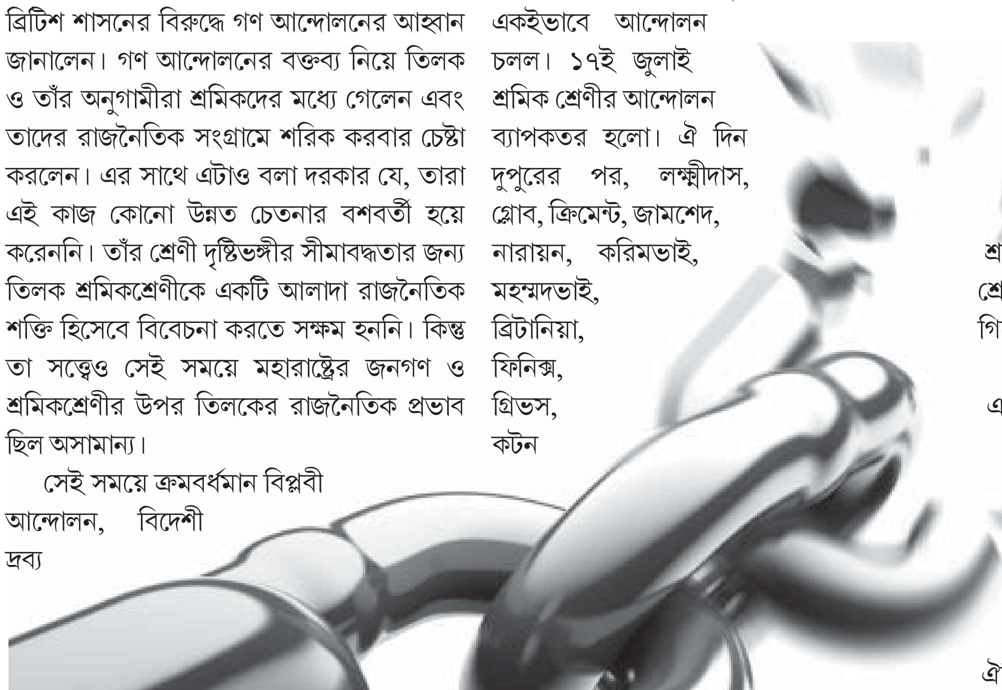

২২শে জুলাই তিলকের বিচারের শেষ দিন। ঐ দিনটা ছিল প্রচণ্ড দুর্যোগপূর্ণ। সকাল থেকে তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি হয়েছিল। এই দুর্যোগকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ হাইকোর্টের সামনে জড়ো হলেন। তিলককে ছ বছর কারাবাসের সাজা দিয়ে আদালত থেকে গোপনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। ক্রুদ্ধ জনতা কি করবে বুঝতে না পেরে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু শ্রমিকরা একটা কর্মসূচী নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

২৩শে জুলাই থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধর্মঘট শুরু হলো। বোম্বাই-এর শ্রমিকরা তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু করলেন। ঐদিন ১ লাখ শ্রমিক ধর্মঘট করলেন এবং তার সঙ্গে বোম্বাই-এর জনগণ হরতাল পালন করলেন। শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে শহরের জনগণের ব্যাপকতম অংশ যোগ দিলেন।

২৪শে জুলাই জনতার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ শুরু হলো। হিংস্র ব্রিটিশ পুলিশ শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভয় না পেয়ে শ্রমিকরা প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। চলল বোম্বাই শহরের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ড যুদ্ধ। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর 'স্ট্রিট ফাইটিং' এর হাতে খড়ি হলো বোম্বাই-এর রাস্তায়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সংযোজন ঘটল।

শ্রমিকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য ইউরোপীয় অফিসারদের নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী অগ্রসর হলো এবং ব্রিটিশ অফিসাররা শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ হবার আদেশ দিলেন। কিন্তু পুলিশ এটা ভাবতে পারেনি যে তারা এমন এক শ্রমিক জনতার মুখোমুখি হয়েছে, যারা নিজের শ্রেণীর শক্তি মর্যাদা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে গিয়েছিল।

পুলিশের হিংস্র আক্রমণে শ্রমিকরা প্রথমে একটু পিছু হটলেও তারা আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে জমায়েত হলো। পুলিশের গুলিবর্ষণের পাল্টা হিসেবে তারাও পুলিশের দিকে প্রবলভাবে ইট পাথর ছুঁড়ে প্রতিরোধ শুরু করলো। অসীম বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে লড়েও এই অসম লড়াই-এ বেশিক্ষণ শ্রমিকরা টিকে থাকতে পারেনি। বহু শ্রমিক ঐদিন নিহত ও আহত হলেন। যাঁরা নিহত হলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল গণপত গোবিন্দ। তিনি শহীদ হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জনতাকে সাহসের সঙ্গে লড়বার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে- ঐদিনের সংঘর্ষে ব্রিটিশ সরকার কোনো ভারতীয় পুলিসকে নিয়োগ করেনি, কারণ সরকারের কাছে খবর ছিল যে বোম্বাই-এর ভারতীয় পুলিশের বেশীর ভাগই তিলকের কারাদণ্ড দানের জন্য বিক্ষুব্ধ ছিল।

শ্রমিকদের ধর্মঘট এত সুসংবদ্ধ ছিল যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য শহরের ছোট দোকানদারেরা শ্রমিকদের কাছে কেনা দামেরও কম দামে চাল বিক্রি করতেন।

২৫শে জুলাইও সংগ্রাম চলল। ২৬শে জুলাই ব্রিটিশ সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে ভারতীয় মালিকরা খোলাখুলি ধর্মঘট ভাঙার কাজে নেমে পড়ল। ২৭শে জুলাই নতুন নতুন শক্তি সংঘর্ষে যোগ দিল। শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ শ্রমিকদের পক্ষেই ছিল। তারা এবার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। ছোট ব্যবসায়ীরাও বিক্ষোভ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করলো। গুজরাটি ভাষায় তিলকের ফটো সহ ছাপানো লিফলেট বিলি করে শ্রমিকরা জনগণকে ব্যাপকভাবে যোগদানের আহ্বান জানালেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করলো। জনতাও শহরের অলিতে গলিতে বিভক্ত হয়ে পুলিশের উপর অবিরাম ধারায় ইট-পাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। ঐদিন প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেশবলাল কাঞ্জী নামে একজন গুজরাটী ব্যবসায়ী। অন্যান্যদের সাথে কাঞ্জীও পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২৮শে জুলাই-এর সংঘর্ষে শহরের খেটে খাওয়া মানুষের নতুন আরেকটি অংশ যোগ দিলেন। এরা হলেন শহরের গৃহভৃত্য। বিভিন্ন বাড়ির ছাদ থেকে এবং অলিতেগলিতে জমায়েত হয়ে এরা পুলিশ-মিলিটারির উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধ চালিয়েছিল।

২৩শে জুলাই যে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল ২৮শে জুলাই তার পরিসমাপ্তি ঘটল। তিলকের কারাদণ্ড হয়েছিল মোট ৬ বছর। সেই ৬ বছর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধেই এই ছ'দিনের রাজনৈতিক সংগ্রাম- এক এক বছর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে এক এক দিনের ধর্মঘট। এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন ২০০ জন এবং বহু সশস্ত্র মানুষ আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

কি চোখে দেখব এই মহান লড়াইকে!

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর রুখে দাঁড়ানোর পদ্ধতিটি ছিল পৃথিবীর দেশে দেশে অনুসৃত শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি হলো রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের পদ্ধতি এবং সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য মোকাবিলার পদ্ধতি। প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠার সময় প্যারিসের শ্রমিকরা সহজাত সংগ্রামী প্রেরণার বশবর্তী হয়েই সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতি এভাবেই নিজস্ব ধারায় ঘটেছে। আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর দেখানো পথেই অর্থাৎ রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট ও প্রকাশ্য প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই পদ্ধতি ও পথ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব। সেই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর কোন নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি ছিল না। এসব সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব সংগ্রামী কায়দাতেই অগ্রসর হয়েছিল। বোম্বাই-এর শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামের এই ধারা ছিল তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। সাথে সাথে এটাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর তাঁদের নিজস্ব পরিচালনায় ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-সংগ্রামের সঠিক পদ্ধতিটাই ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

Declaration No. 178/04; 18.11.04

বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি

আবার খাদ্য-দাঙ্গার আশঙ্কা

বিশ্বজুড়ে বেড়ে চলেছে খাদ্যের দাম। এবং ডিসেম্বরে যে পরিমাণ খাদ্যের দাম বেড়েছে, তা তিন বছর আগে বিভিন্ন দেশে খাদ্যাভাব ও খাদ্য দাঙ্গার যে পরিস্থিতি তৈরী করেছিল, তার পুনরাবৃত্তির অবস্থা তৈরী করেছে। এই তথ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে।

এই রিপোর্ট অনুসারে এবছরটা জুড়ে খাদ্যের দাম চড়া হারে বাধা থাকবে। এবং তার ওপর মজুতদারির সমস্যা গুরুতর সংকটকে হাজির করতে পারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশ্বের তথ্য রপ্তানি বাজারে পণ্যের দাম হিসেব করে। এই হিসেবটা আমেরিকার সুপার মার্কেটের জন্য যা হিসেব, তার চেয়ে ঢের কম। দেখা যাচ্ছে আমেরিকাতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণটা খুব বেশি হবে না। অনুমান করা হচ্ছে এটা বড়জোর ২-৩% হবে। কিন্তু পরিস্থিতিটা একেবারেই উল্টো হবে গরিব দেশগুলোতে, যারা মূলত খাদ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের খাদ্য মূল্যের সূচক জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বেড়েছে ৩২%।

ভোজ্যতেল, খাদ্যশস্য, চিনি ও মাংসের দামের বৃদ্ধির ফলে এই হারটা বেড়েছে, এবং বলা হচ্ছে যে এই সামগ্রীগুলোর দাম আরও বাড়তে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ মূল্য থাকলে তা গরিব দেশগুলোর বাজারেও স্থায়ী বর্ধিত মূল্যের রূপ নিচ্ছে। তার ফলে ২০০৭-০৮ সালে পৃথিবীর দেশে দেশে যেভাবে খাদ্য দাঙ্গা হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি তৈরী হয়ে যেতে পারে। সেই সময়ে, পেট্রোপণ্যের উচ্চ মূল্য, বিশ্বজুড়ে খাদ্যের চাহিদা, এবং বিভিন্ন জায়গায় চাষে কম ফলনের ফলে গরিব দেশগুলোতে খাদ্যের দাম ব্যাপক ভাবে বেড়ে যায় এবং মিশর, হাইতি, সোমালিয়া, ক্যামেরুন সহ বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ খাদ্য-দাঙ্গা হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেব অনুসারে, পৃথিবীতে প্রায় দশ কোটি মানুষ যথেষ্ট খাদ্য পায় না। এবং এবার যা পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে, তাতে এটা নির্ঘাত বাড়বে।

ইরানের চিত্রপরিচালক জাফর পানাহির সাজা

সরকার বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অপরাধে ইরানের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক জাফর পানাহিকে ৬ বছরের কারাদন্ড দিল সেদেশের সরকার। তার সাথে মহম্মদ রাসুলভ নামে আর এক চিত্রপরিচালককেও সাজা দেওয়া হয়েছে। শুধু জেল নয়, তার সাথে ২০ বছর তিনি কোন সিনেমা বানাতে পারবেন না, যেতে পারবেন না বিদেশেও। ইন্টারভিউ দিতে পারবেন না কোথাও।

জাফর পানাহি শুধু বহু পুরস্কার বিজয়ী চিত্র পরিচালক ছিলেন না, তার ছবির মধ্যে দিয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে ইসলামী ফতোয়ার বিরোধিতা করে এসেছেন। তার সর্বশেষ ছবি অফসাইড, যা বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সিলভার বিয়ার পুরস্কার পায়, তার বিষয়ও ছিল ফতোয়া অগ্রাহ্য করে একটি মেয়ের ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাওয়ার কাহিনী, যার ছত্রে ছত্রে প্রতিবাদ ধ্বণিত হয়েছে সেখানকার মৌলবাদের বিরুদ্ধে।

সরকার বিরোধী বিক্ষোভের জেরে ২০০৯ সালের ৩০ শে জুলাই তিনি প্রথমবার গ্রেপ্তার হন, তারপর অনেক পথ ঘুরে এই সাজা।

বাংলাদেশ

বস্ত্রশিল্পে আন্দোলন চলছেই

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে এক অস্থিরতার বছর পেরোল। একদিকে বিশ্ব জুড়ে মন্দা, আর বাংলাদেশে নয়া মজুরি কাঠামোর দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন, অসন্তোষ, অবরোধ, ভাঙচুর আর হিংসাত্মক প্রতিবাদ ঘটে একের পর এক। একের পর এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে সাধারণ শ্রমিকদের প্রাণহানি, শ্রমিক বিক্ষোভ, আর কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে।

অস্থিরতা সারা বছর ছিল চোখে পড়ার মতো। এক বছরে এখানে ভাঙচুর সহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত হয়েছে ৫০ জন। প্রতিটি ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন করলেও কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন হয়নি। গত বছর কমপক্ষে ১০টি তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে। সর্বশেষ ১১ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ইপিজেডে বিদেশী মালিকানার একটি কোম্পানির ১৩টি প্রতিষ্ঠানে একযোগে বিক্ষোভ হয়। এদিকে কুড়িল বিশ্ব রোডে বস্ত্রশিল্প কারখানা ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শ্রমিক নেত্রী মোশরেফা মিশুকে ১২ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়।

পোশাক শিল্পখাতে ছোট ও বড় ১৪টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বছরের প্রথমদিকে গাজীপুরের গরিব অ্যান্ড গরিব বস্ত্রশিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ২০ জন মারা যায়। সর্বশেষ ১২ই ডিসেম্বর হা-মিম গ্রুপের একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ৩০ জন নিহত হয়েছে। পোশাক শিল্পখাতে এক বছরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৫০ জন মারা গেছেন।

বিশ্ব মন্দার কারণ দেখিয়ে সরকার যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল, তা এখনও বাস্তবায়িত করেনি। বিশ্ব মন্দার কারণে চলতি অর্থবছরে সরকারের পক্ষ থেকে পোশাক শিল্প মালিকদের জন্য এ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এতে মোট রপ্তানির ৫ ভাগ ভর্তুকির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, যে সব ব্যবসায়ী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রপ্তানি করেছে তাদের ২ ভাগ ভর্তুকি দেয়ার কথা রয়েছে। এসব অর্থ এখনও ছাড় দেয়া হয়নি।

অন্যদিকে, পোশাক শিল্পের রপ্তানি যেমন বেড়েছে তেমনি নতুন বাজারও সম্প্রসারিত হয়েছে। এজন্য পোশাক শিল্প মালিকরা বিশ্বের কয়েকটি দেশও সফর করেছে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে রপ্তানি অনেক বেড়েছে। অপরদিকে হংকং, জাপান, মেক্সিকো, ব্রাজিল, তুরস্ক, চিলি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পোশাক রপ্তানিরও একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বছরের প্রথম থেকে পোশাক শিল্পে প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল নতুন বেতন কাঠামো। দেশের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের জঙ্গী বিক্ষোভের জেরে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে এ কমিটি বিভিন্ন সময় ৫০টিরও বেশি বৈঠকে বসে। শ্রমিকদের দাবি ছিল নতুন বেতন কাঠামোতে সর্বনিম্ন বেতন হবে ৫ হাজার টাকা। মালিকপক্ষের দাবি ছিল নতুন কাঠামোতে বেতন হবে ২৬ শ' টাকা। শেষ পর্যন্ত ৩১ শে জুলাই মালিক-শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ৭ স্তরবিশিষ্ট নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু তা বহু জায়গায় রূপায়িত হয়নি। ডিসেম্বরের শেষেও ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ কয়েকটি জেলার অন্তত ২৫টি বস্ত্রশিল্প ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। ঘোষিত পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদানের দাবিতে এবং শ্রমিক ছাঁটাই ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে এসব বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বেশ কয়েক জায়গায় কারখানা ও যানবাহন ভাঙচুর করেছে। তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে বস্ত্রশিল্প কর্তৃপক্ষকে মারধর ও লুটপাটের অভিযোগ করা হয়েছে।

শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর সরকার নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করেছে। আশা করা গিয়েছিল নতুন পে-স্কেলে সবটা না হলেও শ্রমিকদের ন্যূনতম কিছু প্রাপ্তি ঘটবে, তাতে বস্ত্রশিল্প সেক্টরের অস্থিরতা দূর হবে। তাহলে এতগুলো বস্ত্রশিল্প কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কেন?

অভিযোগ উঠেছে, বেশ কয়েকটি বস্ত্রশিল্প ফ্যাক্টরি নতুন পে-স্কেল মেনে নভেম্বর মাসে বেতন দেয়নি। এসব বস্ত্রশিল্প মালিকের আচরণ বরাবরই হঠকারী। নতুন পে-স্কেল না দেওয়ার জন্য শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হলে তার দায় এসব মালিককেই নিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে সরকার বা বস্ত্রশিল্প মালিকদের সংগঠন কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই এখন দেখার।

কিছু বস্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা নতুন পে-স্কেল কার্যকর করলেও শ্রমিকদের গ্রেডিং নিয়ে কারসাজি করেছে। পুরনো ও দক্ষ শ্রমিকদের গ্রেড কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের বেতন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সমান হয়ে গেছে। গ্রেড কমিয়ে দেয়ায় অনেকের বেতন আগের চেয়ে কমে গেছে। অথচ এসব শ্রমিক প্রত্যাশা করছিল, নতুন পে-স্কেলে তাদের বেতন-ভাতা বাড়বে। শ্রমিকদের কম বেতন দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার গ্রেডের অবনমন ঘটানো প্রতারণার শামিল। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর বস্ত্রশিল্প মালিকের শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা রয়েছে। তারা শ্রমিকদের বঞ্চিত করতে নিত্য-নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে সিদ্ধহস্ত। ঈদুল আজহায় শ্রমিকরা একবার মালিকদের কৌশলের শিকার হয়েছে। এই শ্রেণীর মালিকের হীন কর্মকান্ডের কারণে গোটা বস্ত্রশিল্প সেক্টরই অস্থির হয়ে ওঠেছে। বস্ত্রশিল্পের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

ভূ-উষ্ণায়ন

৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

বাতাসের কিছু গ্যাস রাতে পৃথিবীর ছেড়ে দেওয়া এই তাপের কিছু অংশ শুষে নেয়। ফলে পৃথিবী সব তাপটা ছাড়তে পারে না; পৃথিবী গরম হয়ে ওঠে। এই গ্যাসগুলো হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা CFC ইত্যাদি। গত দুশো বছর ধরে এই গ্যাসগুলো এত বেশী পরিমানে বাতাসে মিশছে যে পৃথিবী ক্রমশই গরম হয়ে উঠছে। কলে কারখানায়, গাড়িতে জাহাজে, এরোপ্লেনে বিপুল পরিমানে কয়লা ও তেল পোড়ানোর ফলেই বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমান বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি যে দেশগুলোয় কলকারখানা অনেক বেশী, তারাই সবচেয়ে বেশী কার্বনডাই অক্সাইড বাতাসে ছাড়ে। তার ফল ভোগ করতে হয় সারা বিশ্বকে। নাইট্রাস অক্সাইড এরকম আর একটি গ্যাস যা মূলতঃ উৎপন্ন হয় জেট প্লেন থেকে। আমার আপনার মত যারা কোনদিন জেটপ্লেন চড়াতো দুরে থাক, মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থাতেও জেটপ্লেন দেখেনি তাদেরও ভূ-উষ্ণায়নের ফলটা ভোগ করতে হবে, (হয়তো জেটপ্লেনে চড়া লোকের থেকে বেশীই হবে)। ফ্রীজ, এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন, কল্ড স্টোর ইত্যাদি থেকে বেরয় ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন বা CFC, যার তাপ শোষন করবার ক্ষমতা কার্বনডাই অক্সাইডের থেকে দু হাজার গুন বেশী।

বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইড অনেকটা শুষে নেয় গাছ। কাঠের মধ্যে অনেকটা কার্বনডাই অক্সাইড আটকে থাকে। বড় বড় খনি কোম্পানির লাভের কারণে হাজার হাজার হেক্টর জঙ্গল উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বড় লোকদের বেশী মাংস খাবার লোভ মেটানোর জন্য জঙ্গল সাফ করে গরুর ফার্ম করা হচ্ছে। এইভাবেও ভূ-উষ্ণায়ন বাড়ছে।

ভূ-উষ্ণায়নের এই মারাত্মক বিপদ নিয়ে মানব দরদী বিজ্ঞানীরা যত বলছেন, সাধারণ মানুষের সচেতনতাও ততটাই বাড়ছে। পৃথিবীকে এই বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য 'কিয়োটো বিধি' নামে একটা আন্তর্জাতিক বিধি তৈরী করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত ৫৫ টা দেশ, যারা পৃথিবীর বাতাসে প্রতি বছর যতটা কার্বনডাই অক্সাইড মেশে তার ৫০ শতাংশই তৈরী করে, তারা কার্বনডাই অক্সাইড তৈরির পরিমানটা একটু কমাক। বেশী নয়, ১৯৯০ সালে তারা যা কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরী করেছিলো তার মাত্র ৫ শতাংশ কমাক। কিন্তু চীন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'কিয়োটো বিধি' মানতে নারাজ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট খোকা বুশ তো সরাসরি বলেই দিয়েছিল কিয়োটো বিধি মানলে মার্কিন কোম্পানী গুলির ৩,৯৪০০০ ডলারের মুনাফা কমবে। মার্কিনরা অত আহাম্মক নয়। অর্থাৎ কিছু লোকের সুখের জন্য, কয়েকটা কোম্পানির মুনাফার জন্য কয়েকশো কোটি লোককে মরতে হবে।

পৃথিবী শীতল হবে কিভাবে:

কয়লা বা তেল না পুড়িয়েও কিভাবে শক্তি উৎপাদন করা যায় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। যেমন সৌরবিদ্যুত বা বায়ুশক্তিতে চলা জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুত ইত্যাদি। ভারতের মত একটা দেশ যেখানে বছরের একটা ভালো সময় ধরে সূর্যালোক পাওয়া যায়, বা যে দেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূল রয়েছে সেখানে সৌর ও বায়ু শক্তির সাহায্যে প্রচুর বিদ্যুত উৎপাদন করা যায়। বর্তমানেই সৌর বিদ্যুত প্রযুক্তি যে উচ্চতায় পৌঁছেছে তাতে গৃহস্থলির সমস্ত বিদ্যুত চাহিদা সৌর বিদ্যুত দিয়ে মিটিয়ে দেওয়া যায়। সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে গাড়ি চালানোর প্রযুক্তিও যথেষ্টই উন্নত। কিন্তু এই সমস্ত প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো হচ্ছে না কারণ তাতে কয়লা ও তেলের উপর নির্ভরশীল একচেটিয়া পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পৃথিবী জুরে যে অসংখ্য কলকারখানা গজিয়ে উঠেছে তার সবগুলিই যে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করছে তা নয়। অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির জন্যও প্রচুর কয়লা, তেল পরানো হয়। যেমন প্লাস্টিক, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, কোকোকোলা, শখের মটর গাড়ি, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি। আবার এমন অনেক পণ্য আছে যে গুলি মধ্যবিত্ত জীবনে প্রায় অপরিহার্য করে তলা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি সত্যিই অপরিহার্য কিনা তা নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যেমন ফ্রীজ, মাইক্রোওভেন ইত্যাদি। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গোবর গ্যাস উৎপাদন তা দিয়ে গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থলির জ্বালানির সমস্যা প্রায় সবটাই মিটিয়ে দেওয়া যায়, তাতে LPG গ্যাস বা কয়লা পোড়ানোর দরকার হবে না। এইভাবে আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। মোট কথা হল অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে যদি উৎপাদন করা যায়, বিনোদন মানে যদি কোকোকোলা খাওয়া বা আরও আরও ভোগ্য পণ্য কেনা না হয়, যদি মানুষের সৃজনশীলতাই বিনোদনের মাধ্যম হয়, একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে উৎপাদন না হয়ে উৎপাদন যদি হয় মানুষের স্বার্থে তা হলেই ভূ-উষ্ণায়নকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তার জন্য গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের স্বার্থে পরিচালিত এক সমাজব্যবস্থা। তাই পৃথিবীকে শীতল করতে হলে শ্রেণী সংগ্রামের উষ্ণতা বাড়াতেই হবে।

মজদুর ক্রান্তি পরিষদ (এমকেপি) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, ৩৬/২ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ রেনবো ল্যামিনেশন কর্তৃক মুদ্রিত। সম্পাদক : অমৃত পৈড়া। ফোন : +৯১-৯৪৩৩২৪২৪৯৮, ইমেল : shramikshakti@gmail.com